মহর্ষি রমণ

বিভুপদ কীর্ত্তি

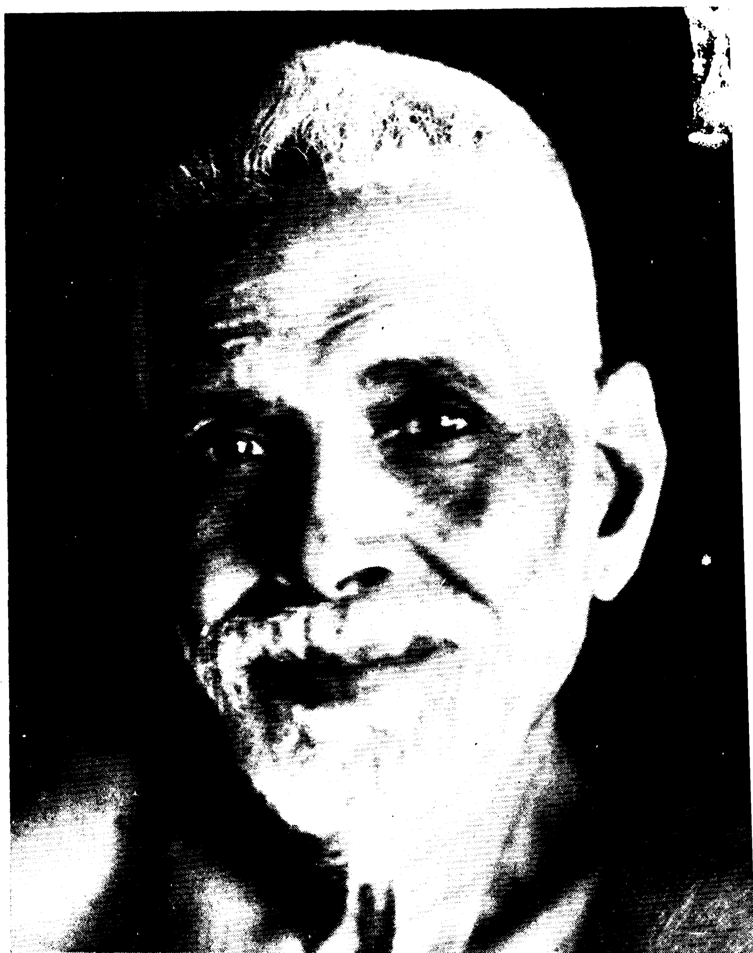
প্রথম সংস্করণঃ
১লা শ্রাবণ, ১৩৫৭

প্রকাশক—
শ্রীহেরম্ব নাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীরমণাশ্রমের পক্ষে

মুদ্রাকর—শ্রী শ্রীশকুমার চক্রবর্ত্তী
নভেল প্রেস
১০৯বি, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীরমণ আশ্রম
পোঃ তিরুভেন্নমালাই, মান্দ্রাজ।
বঙ্গ ভারতী
১২৯এ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।
লেখক
১৫।৪, জামির লেন—বালীগঞ্জ,
কলিকাতা।
চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং
কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ন্যাশনাল প্লানিং সিণ্ডিকেট
২৩।২৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য তিন টাকা



মহর্ষি রমণ

—উৎসর্গ—

স্বর্গগত পিতৃদেব ৺ডাক্তার কান্তিচন্দ্র কীর্ত্তির
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি।

কীর্ত্তি লজ্
১৫।৪, জামির লেন
বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

মহর্ষিকে আমি স্বচক্ষে কোনদিন দেখিনি। বহু ভক্তের চোখ দিয়ে তাঁকে আমি দেখেছি। তাঁকে জেনেছি বলবার মত দুঃসাহস আমার নেই। কিন্তু আমি তাঁর অসংখ্য অজ্ঞাত ভক্তের মধ্যে 'সবার নীচে সবার পিছে' আছি বলে গর্ব করি।

এই রচনাটি সমাপ্ত হয়েছিল এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে। মহর্ষি তখন নরদেহে বর্তমান ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর অগ্রজ-প্রতিম শ্রীহেরম্ব মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহর্ষি সন্দর্শনে সেই সময়ে তিরুভান্নামালাই গিয়েছিলেন। এই বইখানির পাণ্ডুলিপি তিনি অনুগ্রহ করে সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সংগে রমণাশ্রমের সর্বাধিকারী শ্রীমৎ নিরঞ্জনানন্দের নামে একখানি চিঠিও আমি দিয়েছিলাম। সেই পত্রে আমি নিবেদন করেছিলাম আমার এই পাণ্ডুলিপি যেন মহর্ষির শ্রীচরণের স্পর্শ পায়।

আমার এই নিবেদন লৌকিক ভাবে মহর্ষির কর্ণগোচর না হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রার্থনা মহর্ষি পূর্ণ করেছিলেন। বাংলা ভাষার এক বর্ণও যাঁর জানবার কথা নয় তিনি আগাগোড়া সমস্ত লেখাটির পাতায় পাতায় দৃষ্টিপাত করেছিলেন। সেইসময়ে আমার পাণ্ডুলিপি 'অতর্কিতে' তাঁর পায়ের উপরও পড়েছিল। অন্তর্যামী পুরুষ স্মিতহাস্যে এই ঘটনাটিকে সেই ভাবেই বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। আমি জানি, আমাকে কৃতার্থ করবার জন্যই এইভাবে তিনি কৃপা কটাক্ষপাত করেছিলেন। সেই আনন্দেই কথাকয়টি এইখানে লিখে রাখলাম।

রথযাত্রা—
১লা শ্রাবণ, ১৩৫৭

শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি

মহর্ষি রমণ

এই সেদিন, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সাল মহর্ষি রমণের সাধনার জীবনে পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত হ'ল। অরুণাচলের পুণ্যতীর্থে সমবেত হলেন শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রণিপাতের অর্ঘ্য নিয়ে দিক দিগন্তের অগণিত, খ্যাত অখ্যাত পূজারীর দল। বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন দেশকাল পাত্রের বিরুদ্ধ আবেষ্টনকে অতিক্রম করে পরিচয়ের স্রোতগুলি কেমন করে যে পথ চিনে এসে হাজির হ'ল মহামিলনের সাগর-সংগমে—এ এক আশ্চর্য্য সংঘটন। কিন্তু যাঁকে অবলম্বন করে এবং কেন্দ্র করে ঘটে গেল এই অভিনব সমাবেশ, আশ্চর্য বস্তু হিসাবে তাঁর তুলনা সচরাচর মেলে না।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে, মাত্র সতেরো বছরের কিশোর ছেলেটি কোন অলক্ষ্যের আহ্বানে গৃহত্যাগ করে, পরিচিত জীবনের ও অভ্যস্ত জগতের মায়া কাটিয়ে অদৃষ্টপূর্ব অরুণাচলের পাদমূলে যেদিন নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন সেদিনটি ছিল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। 'অলক্ষ্যের আহ্বান' কথাটির যে এ ক্ষেত্রে সার্থকতা আছে, তার প্রমাণ মহর্ষির সমগ্র

জীবন। কে যে কোথা থেকে কেমন করে এসে, সবার অজ্ঞাতসারে কিশোর মনটিকে নিয়ে কি খেলা খেলে গেল, তার পরিচয় হয়তো বা একমাত্র মহর্ষি রমণই জানেন। লৌকিক ভাবে গুরু, মন্ত্রদাতা, পথপ্রদর্শক বলতে যা বোঝায়—এমন কোন যোগাযোগ তাঁর জীবনের মূলে কোনদিন ঘটেছিলো বলে সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ সেই কারণে অলৌকিক প্রাপ্তির বা পরিণতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত কোথাও ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরং মনে হয়, এই আত্মসমাহিত আত্মোপলব্ধির জীবনে যে ভাবে যেটুকু ঘটেছে সেটুকুই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে হয়ে আছে অনুপম। যোগ করবারও যেমন কিছু ছিল না, অতিরিক্ত বোধে বাদ দেবারও তেমনি কোথাও কিছু ছিল না।

মহর্ষি রমণের শৈশব-জীবনের বিবরণ কতটুকুই বা আমরা জানি! বাইরে থেকে দেখলে ঐ বয়সের আর পাঁচটা ছেলের চিরাচরিত জীবনযাত্রা থেকে এমন কোন পার্থক্যই চোখে পড়ে না। পড়াশুনায় আগ্রহ ছিলো না, —ক'টা ছেলেরই বা থাকে? বারো বৎসর বয়সের কালে পিতা সুন্দরম্ আয়ার তিনটি নাবালক ছেলের দায়িত্ব কাটিয়ে লোকান্তরে প্রস্থান করেছেন। দাদাদের বয়সও শাসন কার্য্য রীতিমতভাবে চালাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাকি রইলেন বিধবা মা; সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে। এমনতর অবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারের

"নবজীবনের প্রারম্ভে মীণাক্ষীসুন্দরমের মন্দিরকে উপলক্ষ্য করে ঘটলো আর একটি সূত্রপাত। বন্ধুদের সঙ্গে আগে সেখানে কখনো কখনো যাতায়াত করেছি। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা কিংবা যজ্ঞ-ভস্ম ধারণ করে ঘরে ফিরে এসেছি। তাতে যে কোনরূপ ভাবান্তর বোধ করেছি এমন নয়। এখন যেন মন্দিরে যাওয়াটা প্রাত্যহিক নেশায় পরিণত হল। একা একা গিয়ে কতক্ষণ ধরে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতাম শিব, মীণাক্ষী, নটরাজ অথবা অবতার পুরুষদের মূর্তির সামনে। সারাদেহে বয়ে যেত ভাবের তরঙ্গ। চোখের জলে বুক যেতো ভেসে। এমনি করেই বুঝি জীবকে নিয়ে ঈশ্বরের খেলাটি ওঠে জমে। কখনো বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনায় চিত্ত হ'য় উঠ্‌তো উচ্ছসিত। বিশ্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্তার কাছে ভিক্ষা করতাম ভক্তি। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই প্রার্থনায় থাকতো না ভাষা। ভিতরে-বাহিরে গোপনে-গভীরে চল্‌তো মৌনতার খেলা। বিনা আনন্দে বিনা দুঃখে ধারা বেয়ে ঝরতো চোখের জল। জীবনের দুঃখ বল্‌তে কিই বা আমি তখন জানি যে দুঃখবাদী হব! নির্বাণমুক্তি, পুনর্জন্মরোধ, বৈরাগ্যলাভ—এসবের অর্থও তখন আমার জানা নেই। সর্ব-বস্তুর অভ্যন্তরে যে অনুপম সত্বা সন্নিবিষ্ট হ'য়ে আছে তার সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার ছিল না। জানতাম না যে, এই সর্বগ্রাসী সত্বায় ঈশ্বর ও আমি উভয়েই হয়ে আছি ওতপ্রোত।"...............

এই হ'ল শেষের ভাষায় বলা সুরুর ইতিকথা। প্রথম অধ্যায়েই আছে শেষের পরিচয়। আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে তাঁর জীবনে একটি মাত্র ছেদহীন, বিরতিহীন ধারার বহুবিস্তৃত প্রবাহিনী। তপস্যা করে যাঁকে পেতে হয় বলে আমরা ধারণা করি, তিনি যেন এককালেই এসে জুড়ে বস্‌লেন এই কিশোর বালকের চৈতন্যসত্বার মর্মস্থলে। ইচ্ছা অনিচ্ছা, গ্রহণ বর্জনের, চাওয়া না চাওয়ার প্রশ্নটিই রইলো হ'য়ে আগাগোড়া অবান্তর। প্রার্থনার অন্তিম ফলটিই যখন অনায়াসে আপনি এসে নিজের গরজে হাজির হয়, তখনই বুঝি কৃতকৃতার্থ সাধক মহর্ষির মত করে বল্‌তে পারেন—"তপস্যায় নতুন করে হবার ত কিছু আমি দেখি না। কিছু হওয়াটাই ত একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। যা ছিলাম, তাই আমি আছি—থাকবোও তাই।"

মহর্ষির জীবনে যে অর্থপূর্ণ অধ্যায়টির কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে—এটি ঘটে তাঁর গৃহত্যাগের প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন তাঁর জীবনের মর্মস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত করে সমুদিত হ'ল এক অপূর্ব সত্বা, অন্যদিকে তেমনি আবার সুরু হ'য়ে গেল পারিপার্শ্বিক জগতের সংঘর্ষময় প্রতিক্রিয়া। যে জীবনের অবসান ঘটেছে—স্বভাবতই দুঃসহ হ'য়ে উঠ্‌লো তার দাবী। পুরানো পাঠ্যপুস্তকগুলির মত অসহ্য হ'য়ে উঠেছে পুরাণো জীবনযাত্রার পুনরাবৃত্তি। কর্তব্য বুদ্ধির

অনুশাসন মেনে চল্‌তো যে পুরাণো মনটি তারও হয়েছে মৃত্যু। লৌকিকতার দোহাই দিয়ে কতদিন এ সংঘাতকে এড়িয়ে চলা যায়? বালকের মতিগতির পরিচয় পেয়ে কাকা, দাদা—সবাই প্রমাদ গণলেন। বুদ্ধিমন্ত ছেলেটা এমন করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে! শিক্ষক অতিষ্ঠ হয়ে বেশি ক'রে পড়ার চাপ দিতে সুরু করলেন। গার্হস্থ্য জীবনের স্বস্তি যখন ইপ্সিত পথের অন্তরায় রূপে দুর্বিসহ হ'য়ে উঠেছে, তখন আর এই সব ছোটবড় অশান্তি-গুলির সঙ্গে আপোষ মীমাংসা সম্ভব নয়। কাজেই ধৈর্যের বাঁধ এবার ভাঙ্‌লো।

১৮৯৬ সালের ২৯শে আগষ্ট, শনিবার। ছাত্রজীবনের লৌকিক খোলসটা অকস্মাৎ পড়লো খসে। ঘটনাটি সামান্যই। স্কুলের নির্দিষ্ট সংখ্যক লেখার শেষ হ'তে তখনো বাকি আছে। রমণের মনে হল কেন এ অর্থহীন কর্মভোগ? বই খাতাপত্র একপাশে ঠেলে রেখে ধ্যানের আসনে তিনি স্থির হ'য়ে রইলেন বসে। প্রহরায় ছিলো দাদার সজাগ দৃষ্টি। নেপথ্য ছেড়ে এবার দাদা সাম্‌নে এলেন; বল্‌লেন—"মিথ্যে কেন যে এ পড়াশুনার বিড়ম্বনা!" ব্যঙ্গোক্তি হলেও কথাটি মূলত সত্য। রমণের মনও সাড়া দিয়ে বল্‌লে—"সত্যিই ত! এ অপকর্মের দায়ী আমি কেন হব? যে কাজ আমার নয়, তার জন্য কেন এই প্রাণপাত আয়াস? এখানে আমার সত্যিই ত আর করণীয় কিছু নেই!" সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে চমক মেরে উঠ্‌লো কিছুদিন

আগে শোনা অরুণাচল নামটি। রমণের ভবিষ্যৎ হ'য়ে গেল নির্ধারিত।

অরুণাচল! কি সে, কোথায় সে? বালক রমণের সঙ্গে তার যোগ কোথায়? অরুণাচল নামটির মধ্যে কি ইংগিত ছিলো লুকানো? মাত্নরা ছেড়ে যাবার বছর খানেক আগে এক আত্মীয়ের মুখে 'অরুণাচল' নামটির উল্লেখ শুনেই বালক রমণ উৎকর্ণ হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিলো নামটি যেন বড় প্রিয়, বড় পবিত্র, বড় পরিচিত। অধীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে তিনি তাকিয়েছিলেন অরুণাচল প্রত্যাগত আত্মীয়টির মুখের পানে। দুর্লভ অরুণাচল তীর্থের ফেরৎ এক ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ চোখে দেখা —এ যেন এক অপ্রত্যাশিত, অসম্ভব সৌভাগ্য। প্রথম বিস্ময়ের চমক্ ভাঙলে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। "কোথায় এই অরুণাচল?" বালকের অজ্ঞতায় ভদ্রলোকটি কৌতুক বোধ করেছিলেন। বলেছিলেন "তাও জানো না? তিরুভানামাল্লাইয়ের নাম শুনেছ? সেখানেই অরুণাচল পর্বত!" পটভূমিকা এইটুকুই। কিন্তু তার পিছনে আরও কি ছিল, কে জানে?

গৃহত্যাগের সংকল্প স্থির হ'য়ে গেছে। পথের নির্দেশও মিলেছে। কালবিলম্ব করা আর চলে না। অপ্রত্যাশিতভাবে জুটে গেল পাথেয়। পরের দিনই অর্থাৎ ১৮৯৬ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগী বালকের ঈশ্বর সন্ধানে যাত্রা হ'ল সুরু। যে বিদায়লিপিখানি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ

তিনি গেলেন রেখে, তাতেই স্পষ্ট হ'য়ে আছে তাঁর সংকল্প। ভ্রাতার উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠিখানি অবিকল এইরূপ :

"আমার পিতার সন্ধানে, তাঁরই আদেশক্রমে আমি যাত্রা করেছি এই স্থান হ'তে। সাধু সংকল্প আছে এর যাত্রার মূলে। অতএব এ কার্য্যের জন্য কারুর দুঃখ করবার প্রয়োজন নেই। একে খুঁজে বার করবার জন্য অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন নেই।"

সংক্ষিপ্ত লিপি। ভাবাবেগের বাষ্পটুকুও এর কোনখানে নেই। অথচ প্রিয়জনের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান ও মমতার নিদর্শন এর মধ্যে আছে। কিন্তু আসক্তির কোন চিহ্ন নেই। পরিচিত আত্মজনের সান্নিধ্যত্যাগ-জনিত মর্মপীড়া—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকা, গৃহত্যাগের আকুলতা ইত্যাদি যে সব ভাব আমরা সাধারণত অনুরূপ অবস্থায় কল্পনা করতে পারি সে সবের কোন কিছুই এখানে মেলে না। সবল সুস্থ নিস্পৃহ সহজ মনোভাবের নিদর্শন হিসাবে চিঠিখানির নিরুদ্বেগ সান্ত্বনা মনকে স্পর্শ করে। অথচ এ চিঠিখানির মধ্যে পুনর্মিলনের প্রতিশ্রুতি কোথাও নেই। পিতার সন্তান, পিতৃ পরিচয় জ্ঞাত হ'য়ে চলেছে আপন জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে। পরগৃহে বাসের মেয়াদ হ'ল শেষ। অবশ্যম্ভাবী এই বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ নিস্প্রয়োজন, অসম্ভব প্রত্যাগমনের সংঘটন কল্পে অর্থব্যয়ও নিস্প্রয়োজন। এইটুকুই মাত্র তাঁর বিদায়কালীন বক্তব্য।

দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রকর শিয়রে নিয়ে ভেংকাটারমণের যাত্রা হ'ল সুরু। স্টেশন মাত্র মাইলখানেকের পথ। গন্তব্য পথের সঠিক বিবরণ জান্‌লে টিকিট কিনে ট্রেনে চড়া নির্বিঘ্নেই হতে পারতো। কিন্তু তিরুভানামালাই আর অরুণাচলের অতিরিক্ত আর কিছুই ত জানা হয় নি। অতএব মোটামুটি যে ট্রেনটি ঐ পথের বলে মনে হ'ল তাতেই তিনি চড়ে বস্‌লেন। রেলের টিকিটখানি ছাড়া পাথের বিশেষ কিছুই রইলো না। কিন্তু এ সব চিন্তার স্থান বা অবসর ছিলো কোথায়? ততক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণা সব কিছু হরণ করে স্ব-ভাবটিই উঠেছে প্রবল হ'য়ে। এই ভাবে কতক পথ ট্রেনে কতকপথ হেঁটে, কখনো জাগ্রত কখনো সমাধিস্থ অবস্থায় বহুপথ অতিক্রম করে অরুণাচলেশ্বরের মন্দিরে এসে রমণ উপনীত হলেন। প্রবাসী ফিরে এলো পিতৃগৃহে।

কর্মসংকুল সংকীর্ণ লোকালয়ের সান্নিধ্য থেকে জনারণ্যের দ্বার ঠেলে রমণ আপন সত্বার জনবিরল নির্জনতায় তাঁর নিজের স্থানটি পেলেন খুঁজে। এবার যা কিছু বোঝাপড়া সব নিজের সাথে। দায়িত্ব নেই, কাজ নেই, কর্ত্তব্য নেই, পড়াশুনার চাপ নেই, অভিভাবকের শাসন নেই। পথে ক্ষুৎপিপাসাতুর বালকের প্রতি কৃপা পরবশ হ'য়ে স্বেচ্ছায় একজন বণিক দিয়েছিলেন কিছু মিষ্টান্ন। তার খানিকটা ছিল বস্ত্রের প্রান্তে বাঁধা। এ সঞ্চয়ের প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে। তাই মন্দির প্রবেশের প্রাক্কালে তাঁর মনে হ'ল—জড় দেহটাকে

মিষ্টান্ন দিয়ে আর কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হলেন ভার মুক্ত। উপবীত দিলেন বিসর্জন, মস্তক করলেন মুণ্ডিত, নিস্প্রয়োজন আবরণ-ভার পরিত্যাগ করে ধারণ করলেন কৌপিন। স্নানের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন—জড় দেহটার আবার স্নান কিসের? ফিরে চল্‌লেন মন্দিরের দিকে। কিন্তু অকস্মাৎ পথের মধ্যে নামলো বৃষ্টি। সরোবরের জলের পরিবর্তে দিব্যধারায় অভিষিক্ত হ'ল উপেক্ষিত জড়দেহ। তখনই সেই অবস্থায় বর্ষণ-সিক্ত দেহে রমণ মন্দিরের অভ্যন্তরে করলেন প্রবেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর আত্মসমাধির অতল তলে গেলেন তলিয়ে।

স্বপ্নের অরুণাচল বাস্তবে হ'ল পরিণত। কিন্তু কার কাছে? রমণ নামে যে ব্যক্তিটি ছিল তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব ততক্ষণে গেছে আচ্ছাদিত হয়ে, লুপ্ত হয়ে। অরুণাচলেশ্বর তাকে আত্মসাৎ করে গ্রাস করে নিয়েছেন। অরুণাচল ও রমণের মধ্যে কে কাকে অবলম্বন করে নিজেকে লাভ করলেন, কে বলবে?

প্রথমেই ওঠে অরুণাচলের কথা। দেবতার লীলাভূমি অরুণাচল দাক্ষিণাত্যের সর্বজনবিদিত পূণ্যতীর্থ। বৎসরে বৎসরে, যুগ যুগান্তর ধরে; দূর দূরান্তরের পূণ্যকামীর দল হ'ন সমবেত; নির্জন নিস্তব্ধ পার্বত্যভূমি বহু জনসমাগমে হ'য়ে ওঠে মুখরিত। দশদিন ধরে চলে এই কার্ত্তিকী-উৎসব। শেষদিন পর্ব্বত শিখরে 'কৃত্তিকাদীপম্' নামে বিরাট বহ্নুৎসবের হয়

উদ্‌যাপন। বহুদূর থেকে দেখা যায় এই বহ্নিশিখা, বহুদিন ধরে জ্বলে এই আগুন। ততদিনে সমবেত তীর্থযাত্রীর দল পশ্চাদ্‌গামী স্রোতের মত ফিরে চলে গেছে। চারিদিকের এলোমেলো পর্বতমালার মাঝখানে নিজস্ব অস্তিত্বের স্বতন্ত্রতায় একা পড়ে থেকেছে চিরদিনের একা অরুণগিরি—"তেজোলিঙ্গম্"। এতদিনে হ'ল তার একাকিত্বের অবসান, কারণ এবার যিনি এলেন তিনি পূণ্যকামী নন, পরিব্রাজক নন, নৈষ্ঠিক সাধু নন। চোখে দেখা, কানে শোনবার প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়েছে। স্থানকালের ব্যবধান তাঁর ঘুচেছে বলেই দেশ দেশান্তরের আবেদন গেছে তাঁর কাছে মিথ্যা হ'য়ে। অরুণাচলের নিঃসঙ্গ বুকে তাঁর বিধি নির্দিষ্ট নিজস্ব স্থানটি তিনি গ্রহণ করে অচল হ'য়ে বসেছেন। ফিরে যাবার প্রয়োজন তাঁর আর নেই।

রমণের জীবনে যে নতুন অধ্যায়টি আরম্ভ হ'ল—আপাত-দৃষ্টিতে সেটি খুব সুখকর বলে মনে হয় না। গৃহদুর্গের বাইরে এসে যে পথিক পথকে করে ঘর, পথের যত কাঁটা সে সবও তাকে নিতে হয় বরণ করে। মৌনব্রতধারী এই তরুণ উন্মাদও তাঁর প্রাপ্য থেকে হননি বঞ্চিত। তাঁর আকৃতি প্রকৃতি দেখে ছেলের দল পরম কৌতুক বোধ ক'রলো। ছোট ছোট ইট্-পাটকেলের রূপে তাদের সম্ভাষণ সমানে বর্ষিত হ'তে লাগলো। আত্মরক্ষার জন্য রমণ সহস্র-স্তম্ভ প্রকোষ্ঠের আরও ভিতরের দিকে সরে গেলেন এবং অভ্যন্তরের অন্ধকার গর্ভগৃহে গিয়ে

আশ্রয় নিলেন। আলো বাতাসের সংশ্রবহীন এই রুদ্ধ স্থানে অসংখ্য কীটপতংগের উপদ্রব। কিন্তু এরই মধ্যে স্যাঁৎসেঁতে ভিজে মাটিতে বসে পরমানন্দে তিনি নিজের মধ্যে রইলেন মগ্ন। সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেল, মৌমাছি বোল্‌তা মশা মাছি পিপীলিকার দৌরাত্ম্যে ; স্থানে স্থানে রক্তাক্ত ঘায়ে জমে উঠ্‌লো পুঁয। কিন্তু রমণের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। জড়দেহটার সঙ্গে তাঁর যোগ কোথায় যে এ সব তুচ্ছ ঘটনা তাঁকে স্পর্শ করবে ?

স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হ'য়ে এই সময়ে এলেন রত্নাম্মল। অন্ধকার গুহাবাসী বালক তপস্বীর জন্য বস্ত্র খাদ্য পানীয় এনে হাজির করলেন। ডাকাডাকি করে কোন সাড়া না পেয়ে সমাধিস্থ মূর্ত্তির সম্মুখে সমস্তই রেখে গেলেন সাজিয়ে। কিন্তু যেমনটি যা ছিলো সব যথাস্থানে রইলো পড়ে। পোকামাকড়ের উপস্থিতির মত এগুলিও রইলো অবজ্ঞাত হ'য়ে। নিশ্চেষ্ট রমণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর এক ক্ষ্যাপা সাধুর হল আবির্ভাব। তাঁর নাম শেষাদ্রি। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরও করবার মত কিছু ছিল না। কয়েকজন লোকে মিলে ধরাধরি করে স্থানুর মত নিশ্চল দেহটিকে অন্ধকার গর্ভগৃহ থেকে স্থানান্তরিত করে সুব্রহ্মণ্য মন্দিরে নিয়ে দিলেন তাঁরা বসিয়ে।

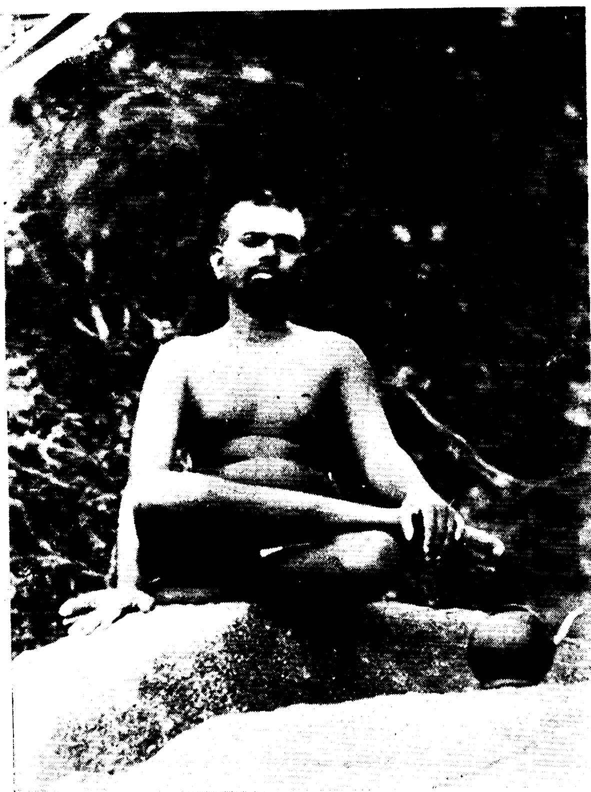
দিনের পরে দিন লোকমুখে "ব্রহ্মণ স্বামী" রূপে রমণের বার্তা ছড়িয়ে গেল। ধীরে ধীরে লোকসমাগম হ'ল সুরু। স্তম্ভিতের

মত লোকে দূর থেকে সসম্ভ্রমে চেয়ে চেয়ে দেখে অমানুষিক তপস্যার রূপ। কৌতূহল আসে ছায়ার মত ভীড় করে, ছায়ার মত সরে যায়। বাহ্য-জ্ঞান রহিত মগ্নচৈতন্যে জাগে না কোন সাড়া, লাগে না কোন আলোড়ন। কোথা থেকে কে এনে মুখে তুলে ধরে কোন দেবপ্রতিমার অভিষেক-স্নানের হলুদ-কলা-জল-চিনি মেশানো অর্দ্ধতরল দুগ্ধের পাত্র। অর্দ্ধবাহ্যদশায় কিছুটা বা তাঁর পেটে যায়, কিছুটা যায় পড়ে। কোথা দিয়ে কাটে দিবারাত্রির নিঃশব্দ প্রহর। কখনো বা একটানা কয়েকদিন পর্য্যন্ত সামান্য একটু খাদ্য গলাধঃকরণ করাবার মত অবস্থাটিও আসে না।

স্বেচ্ছাসেবক রূপে যে কয়েকজন ভাগ্যবান এই সময়ে মহর্ষির পরিচর্যায় ছোটোখাটো অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মৌন স্বামীর নাম। মহর্ষির দীর্ঘদিন ব্যাপী সমাধির অবস্থা যে একটানা অনশনে পর্য্যবসিত হ'তে পেতনা সে কেবল মৌন স্বামী আর তাঁর অনুচরবৃন্দের ঐকান্তিক একনিষ্ঠ সতর্কতায়। সুব্রহ্মণ্য মন্দিরে এই ভাবে কাট্‌লো প্রায় দু'টি মাস। এর পরে মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে সমাধিস্থ অবস্থাতেই বহুকাল তিনি অবস্থান করেন। দেহবোধ-রহিত অবস্থাতেও স্বয়ংক্রিয় ভাবে যন্ত্রচালিতের মত নির্বাহ হ'ত দৈহিক চলাফেরার কায। শীতগ্রীষ্ম, রৌদ্রবর্ষায় ছিল না দেহের বিকার। উন্মুক্ত আকাশের তলে কৌপীন মাত্র সম্বল করে কেটেছে মাসের পরে



তরুণ তাপস



যৌবনে মহর্ষি রমণ

মাস। সেই কৌপীনও যখন জরাজীর্ণ হ'য়ে খসে গেল—কয়েক মাস পর্যন্ত তার অভাবও দেহ টের পায়নি।

মহর্ষির প্রথম ভক্ত—শিষ্য উদ্দণ্ডী নাইনার সমাগত হ'লেন এই সময়ে। লৌকিকভাবে দীক্ষা বল্‌তে যা বোঝায়, মহর্ষি কোন অবস্থায় তা কোন ব্যক্তিকেই দেন নি। প্রথম দর্শনেই নাইনারের মন জড়িয়ে গেল, মহর্ষির চরণে। পণ্ডিত মানুষ, অনেক পড়াশুনা প্রচুর দার্শনিক তত্ত্ব আহরণ করেও উপলব্ধির অভাবে ছিলেন তিনি ম্রিয়মান হ'য়ে। ছোট একটি মঠ স্থাপন ক'রে নির্জনে বাস কর্‌তে কর্‌তে তীর্থভ্রমণের নেশায় মন্দিরে মন্দিরে বেড়াচ্ছিলেন ঘুরে। এমন সময় ইলুপ্পাই গাছের তলায় সজীব বিগ্রহের দর্শন পেয়ে তাঁর মনে হ'ল—এতদিনে, অবশেষে যেন তাঁর ধ্যানের মূর্তি-রূপ পরিগ্রহ ক'রে দেখা দিলেন। মনে হ'ল—তাঁর চাইবার বা পাবার যেন কোনখানে আর কিছু রইলো না বাকি। সেই থেকে ছায়ার মত র'য়ে গেলেন তিনি রমণের সমাধিস্থ মূর্তির আশেপাশে। শীতকাল; সে বছর শীতও পড়েছিল দারুণ। উন্মুক্ত প্রান্তরে সারারাত্রি মহর্ষির দেহবোধমুক্ত নিষ্কল দীপ-শিখার মত উপবিষ্ট ঋজু দেহের সন্নিকটে উপবেশন ক'রে নাইনার অকাতরে নিঃশব্দ পরিচর্যায় ক'রলেন আত্মনিয়োগ। দিনে রাত্রে, কোন সময়েই নাইনারের ছিলো না ছুটি। দিনের আলোয় সন্নিকটে ব'সে পড়াশুনার ফাঁকে মনের আধখানা থাকতো তার প্রভুর অকথিত প্রয়োজনের প্রতি সজাগ। গভীর রাত্রে নিদ্রাকর্ষণ হ'লে সন্তর্পণে

ঘুমিয়ে থাকতেন প্রভুরই কাছাকাছি। অনেকগুলি সপ্তাহই এই ভাবে এলো, গেলো—কিন্তু প্রভু-ভৃত্যে পরিচয়ের লগ্নটি এলো না। অথচ এই একটি মাত্র প্রতীক্ষাই ছিলো নাইনারের চিত্তে যে একদিন না একদিন কোন এক শুভলগ্নে প্রীতি-প্রসন্ন দৃষ্টিমেলে তার ধ্যানের দেবতা তাকাবেন তার দিকে।

আরও একটি যোগাযোগের সূত্রপাত হ'ল এই সময়ে। আন্নামালাই তম্বীরণ নামে এক বাউল সন্ন্যাসী এসে জুটলো। গুরুমূর্তম্ বলে একটি জনবিরল স্থান ছিলো কাছাকাছি, তম্বীরণের আবাস ছিলো সেখানেই। গ্রামে গ্রামে কীর্তণ, ভজন গেয়ে, ভিক্ষা ক'রে চল্‌তো তম্বীরণের দিন। প্রথম দর্শনেই আকর্ষণের জালটি গেল তার পায়ে জড়িয়ে। নিত্যদিনের চলার পথটি তার সেই থেকে মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ ক'রে চল্‌তে লাগলো। কয়েকদিন আসা যাওয়ার পরেই একদিন মহর্ষির অর্ধবাহ্যদশার সুযোগ নিয়ে, সে জানালো তার অন্তরের নিবেদন। ফলে, মন্দির প্রাংগন পরিত্যাগ করে, তম্বীরণের তত্বাবধানে কয়েক মাসের জন্য রমণ এসে রইলেন গুরুমূর্তমে। দেহে সাতপুরু ময়লা পড়েছে, চুলে ধরেছে জট। হাতের নখগুলি হ'য়ে উঠেছে দীর্ঘ। সারাদেহে পিপীলিকার আবাস। যারা দেখতে আস্‌তো ব্যথা বোধ কর্‌তো এই দৃশ্য দেখে। কিন্তু রমণের কিছুমাত্র ভাবান্তর নেই। তম্বীরণের সংগৃহিত ভিক্ষান্নের সামান্যতম অংশ কোনদিন বা এক আধটুকু পেটে যেতো কোনদিন বা তাও যেতো না। মাস

দুয়েক এই ভাবেই কাট্‌লো। যে কারণেই হোক এই সময়ে তস্বীরণকে যেতে হ'ল দূরে। সেবার ভার রইলো নাইনারের উপরে। দৈবক্রমে কিছুদিনের মধ্যে নাইনারকেও যেতে হ'ল অন্যত্র। আবার একাকিত্ব ফিরে এলো মহর্ষির চিরদিনের একা জীবন যাত্রায়।

কিন্তু সংযোগ বিয়োগ যাঁর খেলা, তিনি বোধ করি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারলেন না। অনতিবিলম্বেই সেবকের শূন্য স্থানটি গ্রহণ কর্‌লেন পলণীস্বামী নামে এক মলয়ালী। বিনায়ক মন্দিরে নিত্য পূজার ব্রত তিনি বহুকাল যাবৎ একনিষ্ঠভাবে আস্‌ছিলেন পালন ক'রে। আহার্য হিসাবে দিনান্তে একটিবার মাত্র পূজার নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ কর্‌তেন, আর একান্ত পূজায় ইষ্টদেবতার চরণে নিজেকে দিতেন উৎসর্গ ক'রে। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা বুঝি এতদিনে হ'ল সফল। কে একজন উপলক্ষ হ'য়ে, তাকে এসে বল্‌লেন—"পাথর নিয়েই সারা জীবন কাটাবে, ঠাকুর? গুরুমূর্ত্তমে তরুণ তপস্বীর রূপে দেবতা রয়েছেন মূর্ত হ'য়ে। পাথর ছেড়ে সেখানে গিয়ে শরণ নাও। ধন্য হ'বার পথটি পাবে তাঁরই কাছে খুঁজে।"

কথাটি পলনীস্বামীর মনে লাগ্‌লো। কিন্তু ইষ্টদেব বিনায়ককে যাঁর বিনিময়ে ছাড়া যায়, তাঁকে একবার প্রথমেই না দেখে নিলে চলে কি ক'রে? মহর্ষি সন্দর্শনে অচিরেই তিনি যাত্রা কর্‌লেন। প্রথম দর্শনের পরে মাত্র কয়েকটি দিনই ছিলো

তাঁর পূর্ব সংস্কারের দ্বিধা। শেষ পর্যন্ত মহর্ষির অনতিক্রমনীয় প্রভাবটিই হ'ল জয়ী। পলনীস্বামী জীবন্ত দেবতার সেবকত্ব নিলেন পরিপূর্ণভাবে বরণ ক'রে। শুধু সেবক নয়, শেষপর্যন্ত ভাবোন্মাদ মহর্ষির অভিভাবকের দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হ'ল।

এতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মণস্বামী রূপেই রমণ পরিচিত ছিলেন। তাঁর পূর্ব পরিচয় ছিল অজ্ঞাত। গুরুমূর্তমে অবস্থানকালে অভাবনীয় ভাবে তাঁর পরিচয় গেল প্রকাশ হ'য়ে। উপলক্ষ হ'লেন তম্বীরণ। গোড়া থেকেই তম্বীরণের শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব ছিলো না। কিন্তু ক্রমেই যেন আড়ম্বরের আতিশয্যটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো। ফুল বিল্ব-পত্র থেকে আরম্ভ ক'রে, অগুরু চন্দন পর্যন্ত, ধাপে ধাপে উঠেও যখন ক্রমে শঙ্খ-ঘণ্টা, চামর, দীপাধার পর্যন্ত এসে হাজির হ'ল—তখন ভক্তির অত্যাচারে স্বয়ং মহর্ষি পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন। ইসারায় ইঙ্গিতে যতটুকু বারণ করা যায়, তাতেও যখন অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হ'ল না, তখন বাধ্য হ'য়েই মহর্ষিকে আরও স্পৃষ্টতর উপায়ে মনোভাব জ্ঞাপন করতে হ'ল। তম্বীরণের অনুপস্থিতিকালে একখণ্ড কয়লার সাহায্যে দেয়ালের গায়ে তামিল ভাষায় যা লিখে রাখলেন তার ভাবার্থ হ'ল "আমার এ দেহের সেবার জন্য খাদ্যের অতিরিক্ত আর কিছুরই প্রয়োজন নেই।" তম্বীরণ ফিরে এসে মহর্ষির বিজ্ঞপ্তি পাঠ করলেন। ইতিপূর্বে তাঁর—নাম, ধাম, শিক্ষা, দীক্ষার

কোন পরিচয়ই—ছিলোনা জানা। এই ঘটনায় জানা গেল যে, তিনি তামিল ভাষায় অভিজ্ঞ। কৌতুহল হ'য়ে উঠ্‌লো উদগ্র জনৈক বৃদ্ধ রাজ-কর্মচারীর মনে। বালক সন্ন্যাসীর পূর্ব পরিচয় জান্‌বার জন্য তিনি হ'লেন বদ্ধপরিকর। মহর্ষির সামনে কাগজ কলম এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ নানাভাবে সুরু কর্‌লেন কাকুতি-মিনতি। শেষ পর্যন্ত প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প জানিয়ে প্রার্থিত তথ্য আদায় ক'রে নিলেন। সংবাদ গোপন রইলো না। লোকমুখে মহর্ষির পরিচয় দিকে দিকে গেল ছড়িয়ে।

গৃহ ত্যাগের পর থেকে একাদিক্রমে যে দুটি বৎসরের বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে এই অত্যাশ্চর্য তাপসের অলৌকিক তাপশ্চর্যার একটি মাত্র চিত্রই মেলে। যেখানে যে যখন যেভাবে তাঁকে দিয়েছে বসিয়ে, সমস্ত পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা ক'রে সেই অবস্থাতেই তিনি নিশ্চল হ'য়ে করেছেন অধিষ্ঠান। শোয়া নেই, ঘুম নেই, কথা নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই—দেহ যে আছে, সে বোধও নেই। নিত্য সমাহিত অবস্থায় না ছিল দুঃখ, না ছিল সুখ। অস্থিচর্ম-সার দেহ, প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত বল্‌লেই হয়; অন্যের সাহায্য ছাড়া উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই। অথচ সমাধির নেই মুহূর্তের জন্যও বিরতি। সেবকের পরে এসেছে সেবক, ছায়ার মত এসেছে নিঃশব্দে। আগমনের সংবাদ মহর্ষির গোচরে হয়তো এসেছে এই পর্যন্ত। ছায়ার মত নিঃশব্দে একের স্থানটি অপরে এসে পূর্ণ করেছে। কে এলো, কে গেলো

সে বিষয়ে মহর্ষি ছিলেন না অবহিত। আবাহনও ছিলো না, বিসর্জনও ছিলো না তাঁর। নিস্পৃহ অনাসক্তির দৃষ্টিতে আসা যাওয়া উভয়ই ছিল সমভাবে অর্থহীন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের পর থেকে, পলনীস্বামীর একনিষ্ঠ আত্ম-সমর্পণের প্রত্যুত্তরেই হয়তো বা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে মহর্ষি যেন একটু সচেতন হ'লেন। লোকের ভীড়ে গুরুমূর্তম্ পরিত্যাগ ক'রে, মহর্ষি জনৈক ভক্তের আমন্ত্রণে নিকটবর্তী আম্রকুঞ্জে অবস্থান কর্‌ছিলেন। সঙ্গে ভক্ত বল্‌তে, সেবক বল্‌তে, অনুচর বল্‌তে ছিলেন একমাত্র পলনীস্বামী। উদ্যানে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিলো না। পাশাপাশি দুটি পর্ণ-কুটীরে প্রভু ও ভৃত্যের স্থান ছিলো নির্দিষ্ট। মহর্ষি থাক্‌তেন নিজের ভাবে বিভোর। পলনীস্বামীর দৃষ্টি থাক্‌তো, প্রভুর ক্ষুদ্রতম অকথিত প্রয়োজন সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ। বেচারার সময় কাট্‌তে চাইতো না। বই পড়ে সময় কাটাবার প্রধান অসুবিধা ছিল তার বিদ্যার অভাব। কিন্তু হাতের কাছে যে কয়খানি উচ্চতম দর্শনের গ্রন্থ ছিল, সেইগুলিকেই সাধ্যমত আয়ত্ত কর্‌বার অধ্যবসায়েরও তাঁর অন্ত ছিল না। পদে পদে পাঠ হ'ত ভুল, উচ্চারণ হ'ত অশুদ্ধ, পঠিত বিষয়ের অর্থবোধে হ'ত বাধা। একটি কথাই বারংবার আবৃত্তি ক'রে, পুনঃ পুনঃ পাঠের দ্বারা সচেষ্ট হ'তেন তিনি, দুর্বোধ্যকে আয়ত্তে আন্‌তে। অর্ধবাহ্য-দশায় মহর্ষির কানে আস্‌তো অশুদ্ধ উচ্চারণ সংবলিত শাস্ত্রপাঠের

মৃদুগুঞ্জন। মহর্ষি নিজেও মাঝে মাঝে সচকিত হ'য়ে উঠ্‌তেন। মনে হ'ত শাস্ত্রবাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে তাঁর নিজেরই কথা; যা তিনি জেনেছেন, যা তিনি হয়েছেন, যা তিনি পেয়েছেন সমস্তই যেন হ'য়ে উঠ্‌তো মূর্ত, প্রাণবন্ত। তাঁর উপলব্ধির সত্যগুলি, অনুভূতির অর্থগুলি সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্‌তো অসংবদ্ধ কতুচ্চারিত ছত্রগুলির ফাঁকে ফাঁকে। ঋষিবাক্যের পরমতম সত্যস্বরূপটি ঠিক যেমন ক'রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে তাঁর নিজের জ্ঞানময় উপলব্ধি-লোকে ঠিক তেমনি ক'রে আনন্দে সৌন্দর্যে হ'য়ে উঠেছে বিকশিত আর এক সত্য-দ্রষ্টার অমৃতময় চিত্তলোকে—এই তথ্যটি হ'য়ে উঠ্‌লো মহর্ষির বিশেষভাবে উপভোগ্য। সংস্কৃত মন্ত্রমালার ভাষাগত দুর্বোধ্যতাকে অতিক্রম ক'রে ধ্বনিত হ'ত যে মহাসত্যের ঝংকার—তাতেই তিনি শেষ পর্যন্ত পড়লেন ধরা; মৌনতার বর্ম পরিত্যাগ করে সাড়া দিয়ে বল্‌লেন, যে অর্থ তোমার ভাষার দৈন্যে তুমি অনুধাবন কর্‌তে পার্‌ছো না—সে অর্থ আমি জানি। তুমি পাঠ ক'রে যাও। অর্থ শুনে নাও আমার কাছে।

এই ভাবে দিনের পর দিন চল্‌তে লাগলো শাস্ত্র-চর্চা। আম্র-কুঞ্জের নির্জনবাস ধীরে ধীরে পলনীস্বামীর কাছেও হ'য়ে উঠ্‌লো রমণীয়। কিন্তু বেশীদিন এভাবে চল্‌লো না। যে কারণেই হোক আম্রকুঞ্জের বাস এই সময়ে এলো সমাপ্ত হ'য়ে। মহর্ষি আশ্রয় নিলেন, অরুণগিরিনাথারের মন্দিরে।

যাবার সময় পলনীস্বামীকে বল্‌লেন—"আমার সংগে কারুর যাবার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে তোমার নিজের গন্তব্য-স্থান নিজেই ঠিক করে নাও। একসংগে থাকা আর আমাদের চল্‌বে না।" বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই আকস্মিক এই আঘাতে স্তব্ধ হ'য়ে পলনীস্বামী রইলেন নিরুত্তর। কথাটি না বলে পলনীস্বামী ভিক্ষায় গেলেন বেরিয়ে; কিন্তু সারা অন্তরটি তাঁর মহর্ষিরই আশে পাশে আর্তনাদ ক'রে ফির্‌তে লাগলো। সমস্ত দিন ধ'রে একরকম জোর ক'রেই নিজেকে রাখ্‌লেন বিচ্ছিন্ন ক'রে। সন্ধ্যা হ'ল। পলনীস্বামী ভীত কুণ্ঠিত পদে ফিরে এলেন প্রভুর দ্বারে। বল্‌লেন—"কোথায়, কার কাছে আমি যাবো? জীবনের মন্ত্রটি রইলো তোমার কাছে। সে ছেড়ে আমি দূরে যাবো কোন্ প্রাণে?" অগত্যা পলনীস্বামী র'য়েই গেলেন।

ইতিমধ্যে মহর্ষির পরিচয়-সংবলিত বার্তা দিকে দিকে রাষ্ট্র হ'য়ে লোকমুখে তাঁর স্বগ্রামেও গেছে পৌঁছে। পলাতক পুত্রের অনুসন্ধান প্রচেষ্টায় কয়েকবার ব্যর্থমনোরথ হ'য়েও আশার শেষ সূত্রটুকু সম্বল ক'রে জননী ছিলেন পথের পানে চেয়ে। সংবাদ পেয়েই জনৈক আত্মীয়কে তিনি অনুসন্ধানে দিলেন পাঠিয়ে। আত্মীয়টি এলেন, দেখলেন, যথাসম্ভব সাধ্যসাধনাও করলেন এবং শেষপর্যন্ত মহর্ষির উদ্দেশে বর্ষিত উপরোধ অনুরোধ তাঁর শ্রবণে পৌঁছালো কিনা সঠিক বুঝ্‌তে না পেরে জননী অলগাম্মল-সন্নিধানে

গিয়ে ফলাফল জ্ঞাপন করলেন। বলা বাহুল্য এই ধরণের পরিণতির জন্য জননী প্রস্তুত ছিলেন না। আত্মীয়টির অকৃতকার্যতার জন্য সর্বাংশে তাকেই দায়ী সাব্যস্ত ক'রে, হারানিধিকে ফিরিয়ে আনবার অভিযানে নিজেই করলেন যাত্রা। মনে ছিল আশা, অন্যে না পারুক তিনি মায়ের দাবী নিয়ে নিজে গিয়ে উপস্থিত হ'লে গৃহত্যাগী তাপসকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে নিশ্চয়ই পারবেন। কিন্তু সংসারের সমস্ত হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ ক'রে দিয়ে, যিনি সংসার-বহির্ভূত নিজের চিরদিনের স্থানটিকে পেয়েছেন খুঁজে, মিথ্যা হ'য়ে গেছে তাঁর কাছে এককালে সবাইকার সব দাবী। এই পরম সত্যটি জননী অলগাম্মলের তখনো জানতে বাকি ছিল।

বড় ছেলে নাগস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে, মা তিরুভান্নামালাইয়ে এসে হাজির হ'লেন। জটাজুটধারী উলংগপ্রায় তপস্বীর মাঝখানে মায়ের দৃষ্টি অনায়াসেই তাঁর স্নেহ-মমতার ধনটিকে নিলো চিনে। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে পরিচয়ের কোনরকম সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না—না চেনার, না খুসির, না বিরক্তির। তর্ক যুক্তি, আবেদন নিবেদন, অভিযোগ অনুযোগ—সবই যখন নিঃশেষে হ'ল ব্যর্থ, ততক্ষণে চারিদিকে দর্শকের ভীড় জ'মে গেছে। মায়ের চোখের জলে আশেপাশে অনেকেরই মন উঠেছে ভিজে। কেবল যাঁকে উপলক্ষ ক'রে এত ভাবাবেগের স্রোত ছুটেছে, তাঁর তরফেই নেই কোন সাড়া। মৌনতার প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত

তাঁর নিজস্ব জগতের কোন রন্ধ্রপথে পারিপার্শ্বিক উচ্ছাসের এতটুকু প্রতিধ্বনিও পৌঁছালো বলে মনে হ'ল না। এ যেন এক পাথরের দেবতা, যার মন বলে কোন বস্তু নেই।

মায়ের অশ্রুধারায় যাঁদের মন ভিজেছিলো—তাঁদেরই কয়েক-জনের সনির্বন্ধ মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত মায়ের সাধ্যসাধনার লিখিত প্রত্যুত্তর এলো। কিন্তু মায়ের মনে হ'ল এর চেয়ে নিরুত্তর স্তব্ধতাও যেন ছিলো ভাল। উত্তরটির যথাযথ অনুবাদ পড়লে সবাইকারই মনে হবে যে এতে আর যাই থাক—স্নেহবুভুক্ষু অন্তরের তৃপ্তির খোরাক এর মধ্যে নেই। কথাগুলি এইরূপ :—

“ভাগ্যবিধাতা অতীত কর্ম বা প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে আত্মার গতিবিধান করেন। হাজার চেষ্টাতেও যা ঘট্‌বার নয়, তা ঘট্‌বে না। যা ঘট্‌বার, শত চেষ্টাতেও তার গতি রোধ করা যাবে না। এই সত্যটি ধ্রুব জেনে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকাই সর্বোত্তম পন্থা!”

কে লিখ্‌ছেন, কাকে লিখ্‌ছেন, কোন্ পরিস্থিতির মধ্যে কেন লিখ্‌ছেন তার কোন হদিস্‌ই পাওয়া যাবে না এই নির্ব্যক্তিক লিপির মধ্যে। জননীর কাছে পুত্রবিরহের সান্তনা হিসাবে এর মূল্য যতোটুকুই থাক—ব্যক্তিগত জীবনের উর্ধলোকে আছে যে মহাসমর্পণের সত্যলোক তারই ইংগিত ফুটে উঠেছে এর প্রত্যেকটি কথায়। মহর্ষির মুখে এই কথাটি নূতন নয়।

বরং এই তাঁর চিরদিনের কথা। আত্মবস্তুর সন্ধান যখন থেকে তিনি লাভ করেছেন—তখন থেকেই তিনি সবলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যাবতীয় অনাত্মবস্তুর সংস্রব। সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার যতকিছু অনুভূতি হ'য়ে গেছে তাঁর কাছে স্বপ্নের মতই অর্থহীন। এদের ভিত্তি ক'রে যতকিছু সমস্যা, চিন্তা, প্রশ্ন বা পরিস্থিতি—তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত হ'য়ে গেছে, সংগে সংগে মিথ্যা। চিঠিখানিতে এই ভাবটিই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

এর পরে আশা এবং আবেদন এ দুয়েরই নিষ্ফলতা উপলব্ধি ক'রে মা ফিরে গেলেন দেশে। মহর্ষিও নিম্নভূমির অধ্যায় সমাপ্ত ক'রে, এর সামান্য কিছুদিন পরেই অরুণাচলের গুহায় নিলেন আশ্রয়। নিম্নভূমির অবস্থান শেষ হওয়ার সংগে সংগে মহর্ষির জীবনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতারও ঘটলো পরিসমাপ্তি। পিতৃগৃহের দ্বারপ্রান্তে এসে এতদিনের চলা পথটি গেল এককালে সাংগ হ'য়ে। শেষের ইংগিত ছিলো যাঁর সুরুতেই, এবার যেন তাঁর জীবনে স্থানকালের সমস্ত পরিবর্তনশীলতাই গেল একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে। তাঁর পরিত্যক্ত পথে আসবে নবাগতের দল আর তাঁরই পদচিহ্নগুলি গুণে গুণে চলবে তাদের জীবন-যাত্রার অনুপম সুন্দর প্রবাহ।

অরুণাচল পর্বতের বিরুপাক্ষ গুহায় অবস্থান কালে একটির পরে একটি ক'রে অজানা মানুষ ফুলের গন্ধে মধুমক্ষিকার মত এসে জুটছিলো। প্রথম থেকেই সুরু হ'য়েছিলো এই আনাগোনার

পর্ব। তখন মহর্ষি ছিলেন মৌনতার আবরণে আবিষ্ট হ'য়ে—নিজেকে নিয়ে একান্ত ভাবে ব্যাপৃত। সমবেত মানুষগুলির পানে অনুকম্পার দৃষ্টি নত ক'রে চাইবার মত অবসর তখনো তাঁর ছিল না। এখন থেকে আরম্ভ হ'ল যে অধ্যায়টি তাতে অনুকম্পার লীলাটিই বিশেষ ভাবে প্রকট হ'য়ে ওঠে। পলণীস্বামী এই নব-জাগ্রত দাক্ষিণ্যের ভগীরথ। এর পরেই এলেন শেষিয়ার। উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে জ্ঞানানুরাগ ছিল তাঁর অসামান্য। দার্শনিক আলোচনাতেও তাঁর আগ্রহ বড় কম ছিল না। পদে পদে দুরূহ তত্ত্বের গোলকধাঁধায় পড়ে যখনি তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়তেন তখনি এসে শরণ নিতেন মহর্ষির কাছে। বিনীত দৈন্যের একান্ত প্রসন্নতায় নিজের হাতে ঝাঁট দিতেন মহর্ষির বাস-গুহা। যতক্ষণ একা থাক্‌তেন একমনে কর্‌তেন রামনাম। সুযোগ পেলেই ভিক্ষুকের মত এসে হাজির হতেন মহর্ষির কাছে, নিবেদন কর্‌তেন দ্বিধাগ্রস্ত সমস্যাগুলির বিবরণ। অধীত বিষয়গুলি গ্রন্থ সাহায্যে বুঝতে না পেরে, কাগজ কলম নিয়ে আস্‌তেন মহর্ষি-সন্নিধানে। মীমাংসাগুলি মহর্ষি নিজ হস্তে লিখে দিয়ে সমস্ত সমস্যার ক'রে দিতেন সুমাধান। এইভাবে ধীরে ধীরে মহর্ষির বাণী অনুচর-মণ্ডলীর মাঝে হ'য়ে উঠ্‌লো সংগৃহীত।

এই প্রসংগে শিবপ্রকাশম্‌ পিল্লাইয়ের নামটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পিল্লাই মহর্ষিকে প্রথম দেখেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এবং প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হ'ন। স্বভাবতঃ গম্ভীর চিন্তাশীল

এই মানুষটিকে মহর্ষিরও বোধকার গোড়া থেকেই ভালো লেগেছিল। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির একটা প্রচ্ছন্ন ফল্গুস্রোত যে তাঁর মধ্যে ছিলো তার পরিচয় তাঁর জীবনে প্রচুর ভাবেই পাওয়া যায়, অথচ তাঁর সারা জীবনের জিজ্ঞাসার ফাঁকে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পরিণতি যে দানা বেঁধে উঠ্‌বার স্বযোগ পায়নি এ কথাও ঠিক। বহুদিন পর্যন্ত মহর্ষির সংগ লাভ ক'রেও এই স্বল্প-ভাষী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিটির জীবনে দৃশ্যত এমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি, যেটাকে বিশেষভাবে মহর্ষির প্রভাব বলে বর্ণনা করা যায়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে পিল্লাই সরকারী চাক্‌রিতে দিলেন ইস্তফা। ইতিপূর্বে স্ত্রী বিয়োগ ঘটে জীবনযাত্রার ধারাটায় একটা মোড় ফিরেছিলো। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি যে অবহিত ছিলেন না, তারও প্রমাণ আছে। এখন নূতন ক'রে প্রশ্ন জাগ্‌লো—"অতঃ কিম্?" পুনরায় দারপরিগ্রহ করার প্রশ্নটা মনের মধ্যে ছিলো, কিন্তু তার প্রতিবন্ধকও ছিল পাশাপাশি। উচিত অনুচিতের দ্বন্দ্বের মাঝে নিজের বুদ্ধিতে কোন একটা মীমাংসায় পৌঁছাতে না পেরে, পিল্লাই সমস্যাগুলি কাগজে লিখে নিয়ে গেলেন বিঘ্নেশ্বরের মন্দিরে। সারারাত্রি সমস্যা পূরণের প্রার্থনা ক'রে, দিলেন ধর্ণা। আশা ছিল ভোরের আলোয় লিখিত প্রশ্নের দৈব উত্তর লিখিতভাবে পেয়ে, সমস্ত সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে। সকাল হ'ল কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না। আশাহত বিমর্ষ প্রাণে পিল্লাই নিরুত্তর দেবমন্দির পরিত্যাগ ক'রে এলেন মহর্ষি সন্নিধানে।

যে কয়দিন পিল্লাই মহর্ষির কাছে রইলেন তার মধ্যে একবারও পেলেন না ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করবার সুযোগ। মহর্ষির কাছে সদাসর্বদাই লোকের ভীড়, তার মাঝখানে এ সব কথা তোলাও যায় না। অথচ মীমাংসা একটা না পেয়ে ফিরে যাওয়াই বা যায় কি করে। পিল্লাই মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। কত রকমের সমস্যার কথাই ত লোকে মহর্ষির কাছে এনে হাজির ক'রে। অতএব প্রথম প্রশ্নটি—'সংসারে দুঃখের হাত এড়াবার জন্য কি আমার করণীয়' জিজ্ঞাসা করায় বাধা নেই। কিন্তু এর পরের প্রশ্নগুলি, যথাক্রমে "যে মেয়েটির কথা ভাব্‌ছি তার সংগে আমার বিয়ে হ'বে কিনা?" "যদি না হয়, কেন হ'বে না?" "যদি বিয়ে হয়, খরচের টাকাপয়সা জুটবে কোথা থেকে?" মুস্কিল হ'ল, এইগুলিকে নিয়ে। এই ধরণের প্রশ্ন মহর্ষিকে কেউ ক'রে না। সরলপ্রাণ নিষ্পাপ মানুষটি কয়েকদিন ধ'রে মনের সংগে ধস্তাধস্তি ক'রে—শেষ পর্যন্ত হার মানলেন। নাঃ—হয় না। মহর্ষির কাছে এসব ছোট কথা বলাই যায় না। অপেক্ষা ক'রে আর লাভ নেই। দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো।

সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে তিনি বসে আছেন। অন্যদিনের মত সেদিনও হ'য়েছে বহু ভক্তের সমাগম। পিল্লাইয়ের দৃষ্টি ছিল মহর্ষির মুখে নিবদ্ধ। সহসা তিনি দেখ্‌লেন, মহর্ষিকে বেষ্টন ক'রে আছে অপূর্ব এক জ্যোতির্মণ্ডল। তার মধ্যে আবির্ভূত হ'লেন আবার মিলিয়ে গেলেন অনুপম এক শিশুমূর্তি। পিল্লাই বিহ্বল

হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌লেন। উপস্থিত আর সকলে এ দৃশ্য দেখেন নি। তারা পিল্লাইয়ের ভাবান্তর দেখে কেউ বা হাস্‌লেন, কেউবা বিদ্রূপ কর্‌লেন। পরের দিনও ঘট্‌লো অনুরূপ আর একটি ঘটনা। সেদিন পিল্লাই দেখ্‌লেন বাল-সূর্যের মত অরুণাভ হ'য়ে উঠ্‌লো মহর্ষির সারা দেহ—চারিদিকে বহু পূর্ণিমার উদ্ভাসিত জ্যোতির্মণ্ডল। আরও একদিন মহর্ষিকে তিনি প্রত্যক্ষ কর্‌লেন, স্ফটিকের মত স্বচ্ছরূপে। এইগুলি দেখার মধ্য দিয়ে কেমন ক'রে কি ঘটে গেল, কে বল্‌বে। পিল্লাইয়ের মনের ধারাটি গেল বদ্‌লে। তার মনে হ'ল দৈবানুগ্রহ তিনি লাভ ক'রেছেন। যেখানে যত সমস্যা ছিল সব গেছে এক সঙ্গে মিটে।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে পিল্লাইয়ের কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষির কয়েকটি উক্তি থেকে মহর্ষির ভাবধারা এবং বিশিষ্ট ভংগীর আভাষ পাওয়া যাবে ঃ

পিল্লাই ঃ আমি কে ?

মহর্ষি ঃ আত্মসত্বা দেহ নয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় নয়, কর্মেন্দ্রিয় নয়, নিশ্বাস নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, এমন কি যে সুষুপ্তির অবস্থায় এই সমস্ত বস্তুর কোন অস্তিত্বই থাকে না—তাও নয়।

পিল্লাই ঃ এদের কোনটাই যদি 'আমি' নয়—তবে আমি কি ?

মহর্ষি ঃ এদের সবক'টিকে একে একে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে—আত্মসত্বা তাই। চৈতন্য সত্বাও তাই।

পিল্লাই ঃ কেমন এই চৈতন্যসত্বা ?

মহর্ষি : আমিত্ব চিন্তা নিঃশেষে অবলুপ্ত হ'লে যে সৎ-চিৎ-আনন্দময় অবস্থাটি আসে, তাকেই বলে মৌন বা চৈতন্যসত্বা।

পিল্লাই : ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় কি করে ?

মহর্ষি : দৃশ্যময় জগতের বিলোপ ঘট্‌লে তবেই উপলব্ধি হয় স্রষ্টার স্বরূপ।

পিল্লাই : ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুজগতকে দেখার অবস্থায় ব্রহ্মোপলব্ধি কি সম্ভব ?

মহর্ষি : কখনোই না। দ্রষ্টাকে যদি রজ্জুর সঙ্গে তুলনা করি, তা'হলে দৃশ্যকে তুলনা কর্‌তে হয় রজ্জুতে সর্পভ্রমের সংগে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মিথ্যা সর্পভ্রমটি বিনষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপটি বোঝা যায় না।

পিল্লাই : দৃশ্যজগত কখন লোপ পায় ?

মহর্ষি : যাবতীয় চিন্তার উৎস যে মন—সে তার সর্ববিধ বিকার নিয়ে যখন বিনষ্ট নয়, তখনই ঘটে দৃশ্যজগতের বিলোপ।

পিল্লাই : মন বস্তুটি কি ?

মহর্ষি : সমস্ত চিন্তার সমষ্টি নিয়ে মন। মন এক ধরণের শক্তিরই বিকাশ ; দৃশ্য-জগতরূপে মনই হয় প্রতিভাত। যেখানে এর উৎস, সেই উৎস মুখেই যদি এর বিনাশ ঘটে—তা'হলেই হয় আত্মোপলব্ধি সম্ভব। মনের বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের হয় উদ্ভব। তখন আর আত্মসত্বাকে জানা যায় না।

পিল্লাই : মনকে ধ্বংস করা যায় কি ক'রে ?

মহর্ষি ঃ মনকে বিনষ্ট করবার একমাত্র পন্থা হ'ল "কে আমি ?"—এই জিজ্ঞাসায় লেগে থাকা। এই জিজ্ঞাসাটি উদ্ভূত হয় মানসিক ক্রিয়া রূপে—তা ঠিক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, মনের ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরও হয় অবসান। যে বংশদণ্ড দ্বারা চিতাগ্নির উজ্জীবন ঘটানো হয়—সেও শেষ পর্য্যন্ত হয় ভস্মসাৎ। তখন জাগে আত্মজ্ঞান। অহং যায় মুছে। প্রাণবায়ু ও জীবনী-শক্তির ঘটে অবসান—কারণ একই উৎস পথে অহংসত্বা, প্রাণবায়ু ও জীবনীশক্তির উদ্ভব। এর পরে 'আমি করছি' এই বোধ আর থাকে না। আত্মতত্বের কাছে আমিত্বের সমর্পণই হ'ল সত্যিকারের ভক্তি।

প্রশ্নোত্তরের সবগুলি এখানে দেওয়া যাবে না। যেটুকু দেওয়া হ'ল তাতেই মহর্ষির বক্তব্যের আভাস পাওয়া যাবে। কথাগুলি হয়তো নূতন নয়। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আলোকে, নূতন হয়েই ফুটে ওঠে সত্যের চিরন্তন স্বরূপটি। যে শোনে সে কেবল কথাগুলিই শোনে না, তার পিছনের জ্ঞানময় ব্যক্তিত্বটিরও পায় আভাস। সমস্ত আবেষ্টনটি একযোগে শ্রোতার সমগ্র সত্বার মূলে দেয় দোলা। যে যতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে এসে হাজির হয়, সেই পরিমাণেই লাভের কড়ি অঞ্জলি ভ'রে নিয়ে ফিরে যায়।

প্রায় এই সময়েই, অরুণগিরির সংকীর্ণ পার্বত্যপথ ধরে, দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রকর উপেক্ষা করে, মহর্ষি সন্নিধানে এসে হাজির হ'লেন তৃষিত একটি মানুষ। মানুষটি যে অসাধারণ তা

অনুভব কর্‌বার জন্য, ফিরে দেখবার প্রয়োজন হয় না। মহত্ত্বের ও মনীষার রাজটিকা তার প্রশস্ত ললাটে আঁকা। চোখের দীপ্তি অনন্যসাধারণ। মহর্ষি তখন গুহার বহিঃপ্রকোষ্ঠে ছিলেন উপবিষ্ট। আগন্তুক সাষ্টাংগে প্রণিপাত ক'রে উচ্ছসিত কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লেন—"প্রভু, আমি ভিক্ষুক। তপস্যার স্বরূপ, বহু অনুসন্ধানেও আমি জান্‌তে পারিনি। বেদান্তশাস্ত্র থেকে আরম্ভ ক'রে যেখানে যা কিছু পড়ার আছে, সবই আমি পড়েছি। হৃদয় ভ'রে করেছি জপ। কিন্তু তপস্যা কাকে বলে তা আমি পারিনি নির্ণয় কর্‌তে। শরণ নিলাম তোমার চরণে। তুমি আমাকে তপস্যার উপদেশ দাও।"

ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। প্রায় পনরো মিনিটকাল ধ'রে অপলক দৃষ্টিতে মহর্ষি রইলেন আগন্তুকের পানে চেয়ে। তারপরে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন : "অহং-চিন্তার উৎসপথে, যদি কেউ একাগ্রভাবে রাখে দৃষ্টি—মন যায় সেইখানেই মগ্ন হ'য়ে। তাকেই বলে তপস্যা। মন্ত্র জপ কালে, মন্ত্রধ্বনির উৎস পথে যদি কেউ লক্ষ্য রাখে—মন যায় সেইখানেই আবিষ্ট হ'য়ে। তপস্যা বলে তাকেই।"

আগন্তুকের মনে হ'ল, এমন কথা যেন আর জীবনে কখনো শোনেন নি। মনে হ'ল, এতদিনের অপেক্ষা তাঁর ছিলো যেন এরই পথ চেয়ে। দুরদুর্গম বিচিত্র পথে যে তপস্যার স্বরূপকে তিনি অনুসন্ধান ক'রে হয়েছেন ব্যর্থ—এত সহজে যে তারই

মর্মকথাটি প্রকাশ করা যায়, এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। অথচ কথাটির সারবত্তা প্রাণকে ক'রে স্পর্শ। মনে হ'ল এক নিমেষে যেন তাঁর দিব্যদৃষ্টি গেছে খুলে। এইত তপস্যা;—অত্যন্ত কাছের জিনিস বলেই যেন, এতদিন দিয়েছে এমন ক'রে ফাঁকি। হাত বাড়ালেই তাকে ছোঁয়া যায়। ইচ্ছাটুকু হ'লেই তাকে ধরা যায়। আগন্তুক বিহ্বল হ'য়ে চেয়ে রইলেন। আগন্তুকের নাম কাব্যকান্ত গণপতি শাস্ত্রী। বেদবেদান্ত, কাব্য, উপনিষদ, দর্শন, ইতিহাস, সর্ব্বশাস্ত্র পারংগত মহাপণ্ডিত, মহাকবি, মহাতপস্বী তিনি। দ্বাদশ বর্ষকাল তীর্থে তীর্থে অবস্থান ক'রে কঠিন তপস্যায়, মন্ত্রযজ্ঞে জীবনের অনেকখানি কাল করেছেন অতিবাহিত। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাধনার পথে চরম পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছানো। যত্নচেষ্টা অধ্যবসায়ের ছিল না কোথাও ফাঁক, ছিল না কোন ত্রুটী। আশৈশব ছিল এই একটি মাত্র ধ্যান-জ্ঞান। এই ভাবে জীবনের ত্রিশটি বৎসর কেটে যাওয়ার পরে, মনে হ'ল যেন সারা জীবনের সমস্ত আয়োজনই হয়েছে ব্যর্থ। তপস্যার মূলসূত্রটিই হয়নি ধরা, এবং তারই ফলে সমস্ত কিছুই হ'তে চলেছে ব্যর্থ। লোকপরম্পরায় মহর্ষির নামটি যেন কোথাও শুনেছিলেন। মনে হ'ল তপস্যার চরম সমাধান আছে তাঁরই কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল হ'য়ে তিনি ছুটলেন মহর্ষির কাছে।

মহর্ষির সংস্রবে এসে, এই তপস্বীর জীবনে বহুবাঞ্ছিত পরিণতির রুদ্ধ দ্বার কিভাবে খুলে গেল—বাইরের দৃষ্টি দিয়ে তার বিচার

সম্ভব নয়। হয়তো বা তাঁর জীবন-তপস্যায় কেবল এই যোগাযোগটুকুরই অপেক্ষা ছিল। কেমন করে, কিসের উপলক্ষে কোথাকার অভাবটি কেমন করে যায় মিটে, তা সাধারণের চোখে পড়ার বিষয় নয়। গণপতি শাস্ত্রীর শেষ জীবনের রূপটি যারা দেখেছে, তারাই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে বিশ্বাসে, ভক্তিতে, জ্ঞানে, আনন্দে পরিপূর্ণ জীবন হিসাবে এমনতর আর একটি সচরাচর দেখা যায় না।

একথা মনে ক'রলে ভুল হবে যে, মহর্ষি রমণের কাছে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে যত লোক এসেছে এবং আহরণ করে নিয়ে গেছে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারের ধন, তারা সবাই এসেছে অনুরূপ মহাতৃষ্ণায় তৃষিত হয়ে। সাধারণতঃ দেখা যায় শোকে, দুঃখে, কামনা, বাসনায় জর্জরিত হ'য়ে অথবা নিছক কৌতুহলের বশে, যে মানুষগুলি দিনের পর দিন এসে হাজির হয়েছে মহর্ষির সান্নিধ্যে মানবমনের গভীরতম এই তৃষ্ণার কোন পরিচয়ই তাদের জানা ছিল না। মহর্ষি তাদের উপেক্ষা করে ফিরিয়ে দেন নি। যেখানে যেটুকু অভাববোধের ছিদ্র পথ তিনি পেয়েছেন—সেই পথেই তিনি প্রয়োগ করেছেন তাঁর আকর্ষণী দৃষ্টির অভ্রান্ত শরসন্ধান। প্রচ্ছন্ন তৃষ্ণাটি তুলেছেন জাগিয়ে। সংগে সংগে বেজেছে সত্যিকারের চাওয়ার সুরটি। এই প্রসংগে রামস্বামী আয়ারের কথাটি প্রথমেই বলা যায়।

সরকারী কর্মচারী—রাস্তাঘাট পরিদর্শন ক'রে বেড়ানো ছিল রামস্বামীর কাজ। আধ্যাত্মিকতার কোন ধারই তিনি ধারতেন বলে মনে হয় না। দোষে গুণে সাধারণ মানুষের মত দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছিলো তাঁর জীবন যাত্রা। কি একটা খেয়াল হ'ল—সাধু দর্শনে এসে হাজির হলেন। মহর্ষি ছিলেন একা—তাঁকে দেখে রামস্বামী যে হঠাৎ কেন বিচলিত হ'য়ে পড়লেন তা বলা যায় না। তিনি বলে বসলেন—"অবতার পুরুষেরা আসেন পাপীদের উদ্ধারের জন্য। আমার কি কোন আশা নেই?" স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে মহর্ষি দিলেন সাড়া—"আছে আশা নিশ্চয়ই আছে।" কথা মাত্র এইটুকুই। কথার পিছনে আরও একটা কি ছিল। রামস্বামীর মন গেল মেতে; জড়িয়ে গেলেন তিনি মহর্ষি রমণের সম্মোহন-জালে। এর পরে ঘন ঘন চল্‌তে লাগলো তাঁর আসা যাওয়া। স্বাস্থ্য ভালো ছিলো না। হজম-শক্তি হ'য়েছিলো বিকল। শরীরের গ্লানির ফলে মনেও ছিলো না সুখ শান্তি। মহর্ষির কাছে এ সবই তিনি বলেছিলেন।

অভ্যাস মত সে রাত্রিতেও তিনি মহর্ষির কাছে ছিলেন। মহর্ষি ছিলেন নিস্তব্ধ। হঠাৎ এক সময়ে মহর্ষি করুণার দৃষ্টি মেলে রামস্বামীর দিকে তাকালেন। রামস্বামীর মনে হ'ল যেন সংগে সংগে একটি উত্তপ্ত স্রোত ব'য়ে গেল তাঁর দেহে। একটু পরেই তাঁর ঘুম এলো। গভীর নিদ্রা। সেইদিন সেই

মুহূর্ত থেকে তাঁর লুপ্ত হজম-শক্তি এলো ফিরে। এই ঘটনাটির পর থেকে রামস্বামীর নির্ভরতা মহর্ষির মাঝে যেন একটা ঐকান্তিক অবলম্বনের পেল সন্ধান। ক্রমে ক্রমে উৎসমুখের আচ্ছাদনটি গেল খুলে। ধন্য হওয়ার পথটি রামস্বামীর চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হলো।

কতকটা অনুরূপ অবস্থায়, মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে, স্বামী-পুত্র-কন্যা-হারা লক্ষ্মী অম্মল শোকার্ত্তা হ'য়ে এসে মহর্ষির শরণ নিলেন। জীবনের কোন প্রান্তে ছিল না এতটুকু আলোকের রেখা। দুঃস্বপ্নের মত, পাষাণের ভার হ'য়ে বুকের উপর চেপে ছিল মর্মান্তিক স্মৃতির বোঝা। ভগ্ননীড়ে ছিল না কোন আকর্ষণ। পরিপার্শ্বিক জগতের কোনখানে ছিল না শান্তি। যে শোক পোড়ায় সেই যে শেষপর্য্যন্ত বহ্নিসংস্পর্শে জীবনকে করে তোলে পূত পবিত্র, এ ধারণা লক্ষ্মী-অম্মলের ছিলো না; থাক্‌বার কথাও নয়। কিন্তু এই শোকই তাঁকে মুক্তির সিংহদ্বারের প্রান্তে যেখানে এনে পৌঁছে দিয়ে গেল, সেখানে থেকে আকাশ প্রায় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। অরুণগিরির গুহামুখে মহর্ষির দেবদুর্লভ প্রশান্ত মূর্ত্তির পানে চেয়ে, লক্ষ্মীঅম্মলের মনে হ'ল যেন, সেই-নিমেষেই তাঁর জীবনব্যাপী সমস্ত দুঃখের হ'য়ে গেছে ক্ষতিপূরণ। মনে হ'ল তাঁর জীবনের রিক্ত পাত্রে যতখানি ছিল বেদনা—তার সমস্তটাই যেন এই দৃষ্টিপ্রসাদের স্পর্শ পেয়ে অমৃতে হ'য়ে যাবে রূপান্তরিত।

সম্মোহিতের মত অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্মীঅম্মল যখন পাহাড়ের পথে আবার নেবে এলেন, তখনি তাঁর মনে হচ্ছিল যেন অনেক খানি হাল্কা হ'য়ে গেছে মনের মেঘ। কেমন করে কি হ'ল কে বল্‌বে? সৌর-করে যেমন করে যুগ-সঞ্চিত তুষারের স্তুপ যায় গলে—তেমনি করেই বুঝি মুক্তি পেয়ে গেল প্রবাহের রূপে তাঁর অসহ্য শোকের সঞ্চয়। নূতন করে সুরু হ'ল তাঁর জীবন, মহর্ষিকে কেন্দ্র করে। দিকে দিকে বিস্তৃত হ'য়ে গেল রমণাশ্রমকে ঘিরে, তাঁর অনলস সেবার বাহু। সহজ মানুষের মত দানে, কর্মে, স্নেহে, পূণ্যে জীবন হ'য়ে উঠ্‌লো ভরপূর। ছোট একটি মেয়েকে পালিতা কন্যা রূপে গ্রহণ করে, নূতন করে সুরু কর্‌লেন ঘর-সংসারের খেলা। কিন্তু তাসের ঘরটি দমকা-হাওয়ায় আবার পড়লো ভেঙে। নবজাত শিশুসন্তানকে রেখে লক্ষ্মী অম্মলের পালিতা কন্যাটি মহাপ্রস্থানের পথে চলে গেল। মৃত্যু-সংবাদ-বাহী তার বার্তাটি হাতে নিয়ে লক্ষ্মী অম্মল ছুটে গেলেন মহর্ষির কাছে।

টেলিগ্রাম পড়ে মহর্ষি বালকের মত অশ্রুপাত করতে লাগলেন। একসঙ্গে ঝর্‌তে লাগলো গুরু-শিষ্যার চোখের জল। কে যে কাকে প্রবোধ দেবে, সেইটাই হ'য়ে উঠ্‌লো সমস্যা। কিন্তু আশ্চর্য, এবার আর লক্ষ্মী অম্মল আগের মত করে ভেঙে পড়লেন না। মানুষের জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখগুলি যে মহর্ষির কাছে চিরদিনই ছিল উপেক্ষার বস্তু, তিনিও কিন্তু সর্বহারা

স্নেহ-বঞ্চিতার মর্মপীড়াটিকে মনের মোহ বলে অগ্রাহ্য কর্‌তে পার্‌লেন না। সমদুঃখ-ভাগী রূপে মহর্ষিকে পেয়ে এবার অতি সহজেই লক্ষী অম্মল বীত-শোকা হ'য়ে সহজ অবস্থায় এলেন ফিরে।

এপর্য্যন্ত মহর্ষি রমণের অলৌকিক আবেষ্টনে যতগুলি আগন্তুক নরনারীকে আমরা দেখেছি তারা সবাই অল্পবিস্তর আমাদের ঘরের মানুষ। সংস্কারের সাম্যে এদের মনোভাবের সঙ্গে আমরা পরিচিত বলেই নিজেদের মনে এদের প্রত্যেকটি দুঃখ-সুখের প্রতিধ্বনি খুঁজে পাই। হাম্‌ফ্রিস্‌ এ দলের নন। খাস বিলাতের নবাগত মানুষ—তার উপরে উঁচুদরের পুলিশের লোক। ১৯১১ সালে চাকরী নিয়ে প্রথম এলেন এদেশে। জাহাজ থেকে বোম্বাইয়ে নাব্‌লেন—অসুস্থ অবস্থায়। হাসপাতালে রোগশয্যায় পড়ে থাকা অবস্থায়, স্বপ্নের মত পেলেন কতকগুলি ভবিষ্যতের আভাস। নিছক স্বপ্ন বলেই যেগুলি মনে হ'তে পার্‌তো ভেলোরে পৌঁছে সেইগুলি যখন একে একে বাস্তব রূপে ঘটতে আরম্ভ কর্‌লো তখন এলো তাঁর বিস্ময়ের পালা। অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় যে সব দৃশ্যগুলি তাঁর চোখের সামনে এসে হাজির হ'ত—সেগুলি যে রোগতপ্ত মস্তিষ্কের বিকার নয় বা নিজেরই চিন্তার প্রতিচ্ছবি নয়, এর প্রমাণ তিনি পেলেন ভেলোরের কর্মস্থলে এসে। তেলেগু ভাষার শিক্ষক রূপে যে মুন্সিকে তিনি এখানে পেলেন—স্বপ্নদৃষ্ট

ব্যক্তিগুলির অন্যতম রূপে তাকে চিন্‌তে পেরে হাম্‌ফ্রিস্‌ হলেন বিস্মিত। মুন্সির কাছেও সমগ্র বিবরণটি হ'য়ে উঠ্‌লো রহস্যময়। পড়াশুনা গেল ঘুচে। মুখ্য হ'য়ে উঠ্‌লো এমন সব আলোচনা, যেগুলি ঠিক আধ্যাত্মিক না হ'লেও, অনেকটা তার কাছ ঘেঁসেই যায়। বিরুপাক্ষ গুহাবাসী মহর্ষি রমণের নিখুঁত খুঁটি-নাটি বিবরণ হাম্‌ফ্রিসের জান্‌বার কথা নয়। কাব্যকান্ত গণপতি শাস্ত্রীর প্রতিকৃতির সংগেও হাম্‌ফ্রিসের পরিচয় থাকবার কথা নয়। সরলপ্রাণ মুন্সি মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন, কিন্তু সংগে সংগে এ বিশ্বাসও তাঁর হ'ল যে, গভীরতর পরিণতির পূর্বাভাস হিসাবে এই সংকেতময় স্বপ্নগুলির মূল্য আছে। কোথা দিয়ে কোন পথে যে কোথাকার যোগ-সূত্রের সন্ধানটি এসে পৌঁছায় তা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। এই সত্যটি মুন্সি অস্বীকার করতে পার্‌লেন না বলেই, এর পরে তাঁরই মধ্যস্থতায় হাম্‌ফ্রিস্‌ গণপতি শাস্ত্রীর সংগে হ'লেন পরিচিত এবং পরের দিনই হাম্‌ফ্রিস গিয়ে হাজির হ'লেন মহর্ষির কাছে। মহর্ষি-সান্নিধ্যের প্রতিক্রিয়া যে ভাবে তিনি নিজেই লিখেছেন, তার খানিকটা এখানে তুলে দেওয়া হ'ল।

"গুহায় পৌঁছে মহর্ষির পদ-প্রান্তে আমরা নির্বাক হ'য়ে রইলাম বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হ'ল যেন, আমি নিজের মধ্যে আর নেই। মহর্ষির চোখের দিকে আধঘণ্টা ধ'রে চেয়ে রইলাম। নিষ্পলক গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম না

কোন পরিবর্তন। বোধ হ'তে লাগ্‌লো যেন দেহটি পরমাত্মার মন্দির। এ যেন মানুষের দেহই নয়; আসনে উপবিষ্ট নিথর একটা শবদেহ—ঈশ্বর যাকে নিজের হাতে নিয়েছেন তুলে; ভিতরটি জুড়ে বসেছেন তিনি নিজে—বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে তারই অভ্রান্ত প্রকাশ। ভাষায় কতটুকুই বা বল্‌তে পারি আমার মনোভাব!"

"বসে থাক্‌তে থাক্‌তে দেখলাম এত্ত-টুকু-টুকু ছেলেমেয়েরা দলে দলে এসে হাজির হ'ল। মহর্ষির চারি পাশে তারা ঘিরে বসে রইলো নির্বাক হ'য়ে। কথা নেই, চঞ্চলতা নেই। দিনের পর দিন মহর্ষির সংগে তাদের একটি কথাও হয় না। তবু তারা এমনি ভাবে নিজেরাই আসে, পাহাড়ে উঠে, চুপচাপ এসে বসে থাকে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কাছটিতে। দৃশ্যটি আমার মনকে কর্‌লো গভীর ভাবে অভিভূত।"

মহর্ষির সঙ্গে হাম্‌ফ্রিসের প্রথম দিনের ও পরবর্তী কথা-বার্তার কিছু কিছু এখানে দেওয়া হ'ল। হাম্‌ফ্রিস্‌ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—প্রভু, আমার দ্বারা কি জগতের উপকার হ'তে পারে? মহর্ষি বললেন—"নিজের উপকার করো। জগতের মধ্যে তুমি, তোমার মধ্যেই জগত। বিশ্বের স্রষ্টা যিনি—জগতের উপকারের দায়িত্ব তাঁরই—তোমার নয়।" কথাগুলি হয়তো বা হাম্‌ফ্রিসের ঠিক মনঃপুত হ'ল না। যে ভাবের পরিপার্শ্বিকতায় তিনি মানুষ হয়েছেন, তার মধ্যে ব্যক্তিত্বলোপ অথবা দায়িত্বজ্ঞান

বিলোপের স্বপক্ষে কোন যুক্তিই সহজে গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হাম্‌ফ্রিসের মনোজগতে তীব্র তীক্ষ্ণ যুক্তি-যুগের স্পর্ধিত বৈজ্ঞানিকতা ছাড়াও হয়তো বা একটা নিভৃত বিশ্বাসের অনুভূতিময় সত্বার প্রাধান্য ছিল। মহর্ষির উক্তির সত্যটি নির্বিচারে না হ'লেও তিনি নিঃশব্দে মেনে নিলেন। প্রথম দিনের ঘটনা মোটামুটি এইটুকুই।

পরের দিন আবার ষাট মাইল পথ দ্বিচক্রযানে অতিক্রম করে, অধীর আগ্রহে হাম্‌ফ্রিস্ মহর্ষি-সন্নিধানে তাঁরই অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। যে সামান্য কটি কথা মহর্ষি তাঁকে উদ্দেশ করে বল্‌লেন তাতেই তাঁর এই প্রতীতি জন্মালো যে মহর্ষির অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর জীবনের সবকিছুই যেন একসংগে গেছে উদ্ঘাটিত হ'য়ে। পাতার পরে পাতা, অধ্যায়ের পরে সাজানো অধ্যায়গুলি—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সমস্তটুকু যেন তিনি নিঃশেষে নিয়েছেন পড়ে। তার মনে হ'ল সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে তাঁর জীবনের যতো লোহা, সবই যেন এককালে সোনায় গেছে রূপান্তরিত হ'য়ে।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে—সামান্য কয়েকটি দিনের প্রশ্নোত্তর আলোচনার ফলেই, এই বিদেশী মানুষটি মহর্ষি রমণের বিশিষ্ট ভাবধারা এমন পরিপূর্ণভাবে নিজস্ব ক'রে নিতে পেরেছিলেন। মহর্ষির বাণীর সংক্ষিপ্তসার তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন নিজের ভাষায়। যতটুকু এখানে দেওয়া সম্ভব হ'ল তা থেকেই অনুভূত

হবে যে এগুলি কেবলমাত্র কতকগুলি শোনা কথার সমষ্টি মাত্র নয়। সার্থক মননক্রিয়ার ফলে, বহুভাগ্যে, যে সত্যোপলব্ধি জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়, এর মধ্যে পাওয়া যায় তারই অভ্রান্ত ইংগিত। এর পরে হাম্‌ফ্রিসের পরিণতি কি হ'ল—তা জানা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায়। সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেলেন—ধর্মযাজকের দীন-বেশে। বাইরের দিক দিয়ে এই পর্য্যন্তই ; অন্তরের দিক দিয়ে—পূর্ণচ্ছেদ কোথায় তার হিসাব কে রাখ্‌বে ?

হাম্‌ফ্রিস্‌ লিখছেনঃ "দৃশ্যজগত বহুবিচিত্র, বিস্ময়কর। এক, অদ্বিতীয়, এবং পরমতম বিস্ময়ের যে বস্তুটি আমরা ধারণা করতে পারি না সেটি হ'ল সেই অমিত শক্তি, যার জন্য সম্ভব হচ্ছে সমগ্র দৃশ্যজগৎ এবং তাকে প্রত্যক্ষ করার কাজটি। জীবন, মৃত্যু, দৃশ্য-জগতের নিয়ত পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর উপরে দৃষ্টি রেখো না। দেখা বা প্রত্যক্ষ করার ক্রিয়াটির কথাও ভেবো না। কে দেখ্‌ছে—কার জন্য সমস্ত কিছু সম্ভব হচ্ছে—সেইটিই হ'য়ে উঠুক তোমার চিন্তার বিষয়। এই দ্রষ্টার প্রতি তোমার দৃষ্টি যেন স্থির হ'য়ে থাকে।"

"উপলব্ধি হ'ল, বাস্তবরূপে ঈশ্বরকে দেখা। প্রকৃত ঈশ্বরকে যখনই দেখি রূপক কিংবা আলংকারিক হিসাবে, তখনই করি ভুল। একটুক্‌রো কাঁচের গায়ে রঙিন ছবি এঁকে আলোর সামনে ধরলে সেই রঙ, সেই ছবির প্রতিফলিত মূর্ত্তি দেখা যাবে। পিছনে আলো না থাকলে, কিন্তু পর্দার গায়ে রং বা ছবি কিছুই যাবে না।

দেখা। সাদা আলো, রং করা ছবির মধ্য দিয়ে গিয়ে, যেমন ক'রে ঘটায়:তার প্রতিফলন—ঠিক তেমনি ক'রে মহাচৈতন্য বা ঈশ্বরের আলোর প্রতিফলনে কর্ম্মধারা রূপে বিকশিত হয় মানব চরিত্রের রূপ। ঘুমন্ত বা মৃত মানুষের চরিত্র দেখা যায় না। জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির সংস্পর্শে এসে বিভিন্নভাবে ক্রিয়ারত যে গতিশক্তি চৈতন্যের দ্বারা হয় নিয়ন্ত্রিত, তাতেই প্রকাশিত হয় চরিত্র। রঙিন কাঁচের আড়ালটি ভেদ করে যেতে যেতে আলোক রশ্মি যদি বাধা না পেতো—তাহলে কাঁচের অস্তিত্বটাই আমাদের মনে পড়তো না। এক হিসাবে আলোক-রশ্মির শুভ্র-স্বচ্ছতার খানিকটা হানি না ঘটে, রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে এর বিচ্ছুরণ সম্ভব হয় নি।"

"সাধারণ মানুষের মন এমনি একটা পর্দা। জাগতিক বিষয়ের বহুপুঞ্জিত ভীড় ঠেলে মলিন হ'য়ে এসে পড়ে এরই বুকে চৈতন্যের আলো। এই ম্লান আলোকটুকুই পড়ে তার চোখে। জ্যোতিঃস্বরূপ রয়ে যান দৃষ্টির আড়ালে। তার মন, তার সত্বা, পর্দায় প্রতিফলিত রঙিন ছবিটির মতই এই স্বল্পালোকে হয় প্রতিফলিত। কাঁচের গায়ে রঙগুলির মত করে যদি দৃশ্য জগতটাকে মানুষের মন থেকে মুছে দেওয়া যেত—তাহলেই স্ব-স্বরূপে মহিমান্বিত হ'য়ে প্রকাশিত হতেন জ্যোতির্ময়।"

"সমাধিস্থ ঋষি, মুল দ্রষ্টায় হ'য়ে থাকেন তন্ময়। দৃষ্টিপথে দেখেন না তিনি দৃশ্য; শ্রবণে শোনেন না তিনি শব্দ; বস্তুজগৎ

মনোজগৎ কিছুই তাঁর চেতনাকে করে না স্পর্শ। বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আধ্যাত্মিক জগতে হ'য়ে থাকেন তিনি আত্মহারা।"

"দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মনের যত মেঘ, জাগতিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিতে হবে সরিয়ে। তবেই হবে চৈতন্য-স্বরূপ জ্যোতির্ময়ের প্রকাশ। এ অপসারণ সম্ভব হবে কি করে? মানুষকে মানুষ না দেখে, দেখতে হবে ঈশ্বর সত্বায় অনুপ্রাণিত রূপে। (বুঝতে হবে—নৌকা যেমন হালের পরিচালনায় চলে, তেমনিভাবে ঈশ্বরের ইংগিতে দেহটিও হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত।")

"সত্যিকারের জ্ঞান আসে ভিতর থেকে, বাইরে থেকে নয়। বুদ্ধি দিয়ে বোঝার সমষ্টি জ্ঞান নয়। ঈশ্বরত্বে নিজের রূপান্তর প্রকৃত এবং বাস্তবিকভাবে ঘটা চাই। (এই উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই যে ঈশ্বরই সব এবং সবই ঈশ্বর।")

"বদ্ধ আমি ; কারণ ইন্দ্রিয় সীমার বাইরে কিছুই আমি জানি না। অথচ অতীন্দ্রিয় আমার স্বরূপ ;—তার বিস্তার সর্ব দেহে, সর্ব মনে। আমার প্রকৃত যে সত্বা সীমাহীন, তারই দ্বারা যন্ত্রের মত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সমস্ত দেহগুলি, সমস্ত মনগুলি। নিষ্কলংক শ্বেত জ্যোতিঃস্বরূপের মত আমার যে সর্ববিস্তারী আত্মবস্তু, সে কেন একটি দেহযন্ত্রের সংকীর্ণ সীমানায় সন্তুষ্ট হ'য়ে আবদ্ধ হ'য়ে থাকবে?"

মহর্ষির নিঃসংশয় বাণীর বাহক রূপে হাম্‌ফ্রিসের কথাগুলির মূল্য নিরূপিত হ'লেও আরও একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদা এদের না দিয়ে

পারা যায় না। উপলব্ধির আলোয় ঝলমল এই কথাগুলির মধ্যে তাঁর আত্মপরিচয় হ'য়ে আছে ওতপ্রোত। কিন্তু সে পরিচয় রহস্যময় হলেও পরিপূর্ণ নয়। অতএব আত্মপরিচয় বাদ দিয়ে—তাঁর লিখিত বিবৃতির উল্লিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করার সংগে সংগেই আমরা প্রসংগান্তরে চলে যাব।

মহর্ষি জননী অলগাম্মলকে ইতিপূর্বে আমরা বিচ্ছেদ-বিধূরা জননীর রূপেই দেখেছি। ইতিমধ্যে একের পরে একটি করে বৎসর কেটেছে। পুরাতন দুঃখটিও হয়তো বা সহণীয় হ'য়ে উঠেছে। মাঝখানে জ্যেষ্ঠপুত্র নাগস্বামীর ঘটেছে মৃত্যু, কনিষ্ঠ পুত্র নাগসুন্দরমের স্ত্রী, শিশু পুত্রটিকে রেখে লোকান্তরে করেছে প্রয়াণ, ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে সংসারের আকর্ষণ। মহর্ষির গৃহত্যাগের পর ধীরে ধীরে দীর্ঘ ষোল সতেরো বৎসর গেছে কেটে। এর মধ্যে কয়েকবারই মা মহর্ষি-সকাশে এসে এসে কয়েকদিন করে থেকে গেছেন কিন্তু স্থিতিলাভ করতে পারেননি। কারণ পিছনের টানটি ছিল তখনো জোরালো হ'য়ে। তা ছাড়া পুত্রের স্বাভাবিক বৈরাগ্যকে বিরূপতা বলে ধারণা করবার কতকটা হেতুও তাঁর ছিলো না এমন নয়। প্রত্যাখ্যানের ব্যথাটিকে অভিমান পারেনি ভুলতে। এই আসা যাওয়ার দোটানার মাঝখানে গুহাবাসী পুত্রকে দেখতে এসে জননী পড়লেন অসুখে। বাধ্য হ'য়ে বেশ কিছু দিনের মত বিরূপাক্ষ গুহার সহস্র অসাচ্ছন্দের মাঝখানে শয্যাগত হ'য়ে মাকে পড়ে থাকতে হ'ল।

দুর্দৈব সন্দেহ নেই ; কিন্তু মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-পিপাসু সত্ত্বার দিক থেকে বিধানটি হ'ল মঙ্গলের। বহুদিনের হারানিধিকে তিনি যেন এই উপলক্ষে নূতন করে ফিরে পেলেন। মহর্ষির অলৌকিক সেবা-যত্নে পুত্র-পরিত্যক্তা মাতার বহুদিন সঞ্চিত মনের গ্লানি গেল মুছে। স্বল্প পরিসর গুহায় নেই নড়বার চড়বার স্থান। কোথায় বা ওষুধ কোথায় বা চিকিৎসার উপকরণ! কিন্তু মহর্ষি-সান্নিধ্যের অমৃত-প্রলেপে মা ধীরে ধীরে উঠ্‌লেন আরোগ্য লাভ করে। ফিরে গেলেন ঘরে। কিন্তু যাদের অবলম্বন করে রচনা করেছিলেন, তিনি সংসারের মায়া-নীড়, একে একে তাদের সকলেই গেল সরে। বিধাতা যেন অবশেষে অভ্রান্ত নির্দেশে তাঁর শেষ আশ্রয়ের স্থানটি দিলেন দেখিয়ে। অরুণাচলে এসে মহর্ষি-জননী আশ্রম-জননী রূপে হলেন প্রতিষ্ঠিতা। পুত্রের সেবা, আশ্রমের পরিচর্যা, সমাগত ভক্তমণ্ডলীর সুখ সুবিধার যাবতীয় দায়িত্বই তিনি নিজের কাঁধে নিলেন তুলে। কিন্তু সব কিছুর মাঝখানে তাঁর স্নেহ-প্রীতি সেবা মমতার একটি মাত্র কেন্দ্রস্থল হ'য়ে রইলেন মহর্ষি স্বয়ং। আনন্দে সার্থকতায় কানায় কানায় ভরে উঠ্‌লো পূণ্যবতীর জীবন। মনে হ'ল যেন তিনি নূতন ক'রে ফিরে পেয়েছেন, বহু-কাল-গত শৈশবের জীবনটি।

কিছুদিন এমনি ভাবেই কাট্‌লো। মহর্ষিও প্রথম প্রথম সহজ অন্তরংগতায় জননীকে কর্‌লেন সম্বর্ধিত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ঘট্‌লো পরিবর্তন। স্নেহ-বিমুগ্ধা জননীর মনের ধারাটিকে



পরিণতির শেষ মহিমায়—মহর্ষি



প্রুফ পাঠরত মহর্ষি



আশ্রম প্রাঙ্গনে মহর্ষি



চিরদিনের একা

আত্মোপলব্ধির পথে পরিচালিত কর্‌বার উদ্দেশ্যে মহর্ষি ভাবান্তর পরিগ্রহ কর্‌লেন। সহজ আদান প্রদানের দ্বারটি গেল বন্ধ হ'য়ে। সুরটি গেল কেটে। মহর্ষি জননীকে ডাকেন না, কথা বলেন না। তাঁর ব্যবহারে উপেক্ষার ভাবটিই যেন প্রত্যক্ষ হ'য়ে ফুটে ওঠে। মনে হয় যেন ইচ্ছা করেই তিনি জননীর মনে আঘাত দিতে চান। খুঁজে খুঁজে বার করেন তাঁর পরম দুর্বলতার স্থানগুলি। শাণিত বিদ্রূপের অব্যর্থ সন্ধানে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিতে চান তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কারের ভিত্তিভূমি। জননীর মনে আসে অভিমান, প্রাণে বাজে ব্যথা। অপরাধীর মত কখনো বা হ'য়ে ওঠেন সংকুচিত; নিরুপায়ের মত কখনো বা নিঃশব্দে করেন অশ্রুপাত। সকলের প্রতি যাঁর প্রসন্নতার অন্ত নেই, তিনি যে কেন জননীর প্রতি এমন বিমুখ এর কোন সদুত্তর তিনি খুঁজে পান না। অথচ রোগশয্যায় যে সেবা, যে অপরিসীম স্নেহ-প্রীতির নিদর্শন তিনি পেয়েছেন—তাকেও ত মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না! সমস্যা হ'য়ে উঠ্‌লো যতোই জটিল, বেদনা হ'য়ে উঠ্‌লো যতোই অসহনীয়, ততই তাঁর অন্তর দিনে দিনে হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো অন্তর্মুখী। মহর্ষির জননী তিনি—কায়মনোবাক্যে তাঁকে হ'য়ে উঠ্‌তে হবে, এই গৌরবময় পদ-মর্যাদার উপযুক্ত। দুঃখের মূল্যে তাঁকে অর্জন করতে হবে অমৃতের অধিকার। মহর্ষিকে তিনি এতদিন পুত্রজ্ঞানেই করেছেন স্নেহ। স্নেহান্ধ নয়নের মণি হ'য়ে ছিলো এতদিন

মহর্ষির পার্থিব দেহটাই। এবার ধীরে ধীরে ঘটতে লাগলো তাঁর দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন। মানসিক বেদনার মূলটি অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনোতীত অমৃতলোকের দ্বারপ্রান্তে তিনি পৌঁছে গেলেন।

এমনি ক'রে দুঃখে সুখে আনন্দে বেদনায় দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পথে ঘটতে লাগলো মহর্ষি জননীর নিঃশব্দ রূপান্তর। দেহ মনকে অতিক্রম ক'রে এমন একটি সত্বায় তিনি প্রতিষ্ঠিতা হ'লেন, যেখানে নিশেঃষ আত্মসমর্পণের অনুপম আনন্দটিই কেবল আছে—দেহও নেই, মনও নেই। যন্ত্রের মত উদয়াস্ত পরিশ্রমের ভারে এবার দেহযন্ত্র হ'ল বিকল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এলো শেষের আহ্বান। রোগশয্যায় মহর্ষি গ্রহণ করলেন পরিচর্যার সমস্ত ভার। দিনের পর দিন কর্তব্য-নিষ্ঠ স্নেহময় পুত্রের মত মহর্ষি অক্লান্ত সেবায়, অসীম ধৈর্যে পরিশোধ করলেন মাতৃঋণ। মৃত্যুর ছায়া এলো ঘনিয়ে ১৯শে মে তারিখের অপরাহ্নে। আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে মহর্ষি রইলেন নিশ্চল হ'য়ে জননীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে। সমবেত আর সকলকে আহারের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে মহর্ষি একা রইলেন জননীর কাছে। অনেক রাত্রে প্রতীক্ষিত মৃত্যু এলো।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে এই মহাপ্রয়াণের স্বরূপটি জানা যায়। মৃত্যুশয্যা ছেড়ে মহর্ষি যখন উঠ্‌লেন—তখন তাঁর কথাবার্তা ব্যবহারে মৃত্যুজনিত শোকচ্ছায়ার এতটুকু আভাষ দেখা যায় নি। মৃত্যুকে উপলক্ষ ক'রে সুরু হ'য়ে গেল সারারাত্রির মহোৎসব।

দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ হ'য়েছিল যে দেহাতীত পরম সত্ত্বা—মরণে হ'ল যেন তারই মুক্তি। মহর্ষি নিজে সকলকে আহ্বান ক'রে নিয়ে আহারে গিয়ে বস্‌লেন। তারপরে সারারাত্রি ব্যাপি সংকীর্তন হ'ল সুরু।

জননীর মৃত্যুর পরে সাংসারিক বন্ধন বল্‌তে যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো, তারও হ'ল পরিসমাপ্তি। দৃশ্যত পরিবর্তন কিছুই হ'ল না। মহর্ষিকে কেন্দ্র ক'রে বিচিত্র জনসমাগমের যে ধারাটি গোড়া থেকে চলে আস্‌ছিলো, এখনো ঠিক তেমনিই চল্‌তে লাগলো। প্রশান্ত সহজ নির্লিপ্ততায় নিজের মধ্যে নিজে রইলেন তিনি অবস্থিত। ধীরে ধীরে তাঁর চারিপাশে গড়ে উঠ্‌লো, বর্তমান আশ্রমের ভিত্তি। শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় সমাগত ভক্তমণ্ডলীর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রচেষ্টায় এসে জুট্‌লো গৃহনির্মাণের উপকরণ সম্ভার। দিনে দিনে রূপ পরিগ্রহ কর্‌লো আশ্রমের পরিকল্পনা। ভাণ্ডার বল্‌তে বা সঞ্চয় বল্‌তে ছিলো না কোন কিছু। কাল কি হবে, এ চিন্তারও ছিলো না কোন অবসর। একজনের আনীত দ্রব্য বা আহরিত খাদ্য সবাই সমানাধিকারের ভিত্তিতে নিতো ভাগ ক'রে। কেউ বড় নেই, কেউ ছোট নেই। মহর্ষির নিজের বলতে কোন-দিনই কিছু ছিল না। তার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ক'রে এতটুকু খাদ্য পর্য্যন্ত আন্‌বার নিয়ম ছিলো না। অর্থ তিনি স্পর্শ কর্‌তেন না, প্রয়োজন বলতেও কোনকিছু তাঁর ছিলো না। নিজের দেহটির পর্যন্ত যাঁর কোনো খেয়াল নেই, তিনি যে

আশ্রম ব্যবস্থায় স্বয়ং কোনরূপ সহায়তা কর্‌বেন, সে সম্ভাবনাও ছিলো না। অথচ কত দেশবিদেশ থেকে, দিনের পর দিন এসেছে, অসংখ্য তীর্থযাত্রী। ক্ষুধিত পেয়েছে অন্ন, তৃষিত পেয়েছে পানীয়। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ যে যখন এসেছে সমভাবে হ'য়েছে অভ্যর্থিত। যা যেদিন জুটেছে সবাই খেয়েছে সমভাবে ভাগ করে। সমারোহ না থাকলেও, লোকসমাগমের ছিল না বিরাম। অথচ এ সমস্ত কিছুর মাঝখানে স্বয়ং মহর্ষি থাক্‌তেন আত্ম-সন্তুষ্ট, নির্লিপ্ত, একাকী।

মহর্ষি রমণের জীবনযাত্রার সমসাময়িক আলেখ্য হিসাবে দু' একটি ঘটনার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসংগিক হবে না। একদা গভীর রাত্রে আশ্রমে ঘট্‌লো একদল ডাকাতের আক্রমণ। দরজা জানালা ভেঙে, অধিবাসীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে, ডাকাতের দল তাণ্ডবলীলা সুরু ক'রে দিল। মহর্ষি তাদের প্রচেষ্টায় দিলেন না কোন বাধা। অথচ দৈহিক বলপ্রয়োগের দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত কর্‌বার মত সামর্থের অভাব ছিল না। মহর্ষি বল্‌লেন "না, তা হয় না। আশ্রমে যা আছে তাতে ওদের অধিকার কারুর চেয়ে কম নয়। ওদের ধর্মে যা হয় তা ওরা অবাধে ক'রে যাক্। সে জন্য আমরা আমাদের ধর্ম খোয়াবো কেন? আমরা কেন বাধা দিয়ে ক্ষমার ধর্ম, সহন করার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব?" ডাকাতেরা কথাগুলি শুন্‌লো; প্রতিরোধের আশংকা নেই জেনে বেশ একটু আশ্বস্তও হ'ল। তন্নতন্ন ক'রে চারিদিক খুঁজেও

আশানুরূপ দ্রব্যসম্ভার না মেলায় আশ্রমে অগ্নিসংযোগ কর্তে উদ্যত হ'ল। মহর্ষি বল্লেন "তার প্রয়োজন কি? আমরা বরং আশ্রমের বাইরেই চলে যাচ্ছি তা'হলে আর তোমাদের কোন প্রচেষ্টার ব্যাঘাত হবে না।" অতঃপর মহর্ষি আশ্রমপালিত রুগ্ন কুকুরটির প্রাণরক্ষার জন্য তাকে সযত্নে বাইরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর্লেন। আশ্রম ছেড়ে সবাই বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

দস্যুদল এতেও নিরস্ত হ'ল না। তাদের বিশ্বাস আশ্রমের ধনসম্ভার নিশ্চয়ই কোথাও লুকানো আছে। নির্দয় ভাবে প্রত্যেকটি আশ্রমবাসীকে কর্লো প্রহার। স্বয়ং মহর্ষিও বাদ পড়লেন না। বামপায়ে নিদারুণ ভাবে আঘাত লাভ ক'রে মহর্ষি বলেন—'ইচ্ছা হয় ত ডান পায়েও তোমরা মার্তে পারো।' ভক্ত রামকৃষ্ণস্বামী এবার বিচলিত হ'য়ে উঠ্লেন। এর পরেও দস্যুদল দাবী কর্লো লণ্ঠন, ঘরের সমস্ত চাবি। মহর্ষির আদেশে তাদের সমস্ত দাবীই প্রতিপালিত হ'ল। এতেও যখন উদ্ধত অত্যাচার হ'ল না প্রশমিত—রামকৃষ্ণস্বামী আর নিজেকে সম্বরণ করতে পার্লেন না। কোথা থেকে একটা লৌহদণ্ড সংগ্রহ ক'রে তিনি পাষণ্ডদলনে অগ্রসর হ'লেন। কিন্তু এবারেও তাঁকে মহর্ষির অনুজ্ঞার কাছে মাথা নত কর্তে হ'ল। মহর্ষির যুক্তি সেই এক: "আমরা সাধু। স্ব-ধর্ম ত্যাগ করা যে কোন অবস্থাতেই আমাদের শোভা পায় না। ওরা ভ্রান্ত, ওরা অজ্ঞ। যে ধর্ম আমরা জানি তাতে আমাদেরই থাক্তে হবে অবিচলিত। দাঁতের কামড় মাঝে

মাঝে ঠোঁটে লাগে বলে ত কিছু দাঁতকে ভেংগে ফেলে তার সমুচিত দণ্ড দাও না! রামকৃষ্ণস্বামী নতমস্তকে নিরুত্তর হ'য়ে বসে পড়লেন। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত যথেচ্ছাচার ক'রে দস্যুদল প্রস্থান করলো।

সকালে এলো পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে এমন ভাবে মহর্ষি জবাব দিলেন, যেন বলার মত কোন কিছুই ঘটেনি। তিনি যে নিজে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন—এ কথাই কেউ জানলো না। এবিষয়ে যে রোষের কিছু আছে, ক্ষোভের কিছু আছে সে কথাও এই দিন বা পরবর্তী কোন দিন তাঁর মুখে কেউ কখনো শোনে নি। পৃথিবীতে আত্মবস্তু ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্বই যাঁর কাছে নেই—এমনি ক'রে বুঝি তাঁকে পরীক্ষা দিতে হয়! সমগ্র অস্তিত্বকে পরিব্যপ্ত ক'রে আছে যাঁর চেতনা—তাঁর কাছে যেমন আপন কেউ নেই, পরও নেই কেউ। অথবা যেখানে যা কিছু আছে—অনন্ত চৈতন্যের বহুবিধ প্রকাশ রূপে নিজের মধ্যেই আছে সে সব কিছু।

রমণাশ্রমের আশ্রমবাসীদের কথা ইতিপূর্বে বলা হ'য়েছে। এদের মধ্যে আছেন লক্ষ্মী—আশ্রমধেনু। কমলা আছেন, লীলা আছেন, রোজ্ আছেন, জ্যাক্ আছেন—এরা সবাই সারমেয় বংশধর। জাত্যাভিমান এদের নেই—কিন্তু আশ্রমিক আভিজাত্য সুস্পষ্ট হ'য়ে আছে এদের ব্যবহারে। মহর্ষির স্নেহনীড়ে এদের জন্যও বিশিষ্ট মর্যাদার স্থানটি আছে নির্ধারিত। এরাও যে সে

বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় অবহিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠতায়। মহর্ষির দৃষ্টিতে এরা কেউ ইতর প্রাণী নয়,—মহাপ্রাণেরই সাময়িক আবাসকেন্দ্র প্রত্যকটি জীবজন্তু। অনেক বয়সে কমলা যখন মারা গেল, অশ্রুসজল নেত্রে মহর্ষি কোলে নিলেন তার শিশুসন্তানটিকে। আদরিণী লক্ষ্মী মহর্ষির সস্নেহ সেবা নিত্যপ্রাপ্যরূপেই প্রতিদিন পেতে অভ্যস্ত। কুকুরে আর মানুষে বিশেষ যে কোন পার্থক্য মহর্ষির কাছে আছে—তা মনে হয় না। সেই যে রুগ্ন কুকুরটি যার জীবন রক্ষার জন্য আহত অবস্থাতেও মহর্ষি তৎপর হ'য়ে উঠেছিলেন—তার নাম কারুপুন্। আশ্রমের নিয়মিত অধিবাসী, জীবজন্তুগুলি ছাড়াও, প্রতিদিনের আগন্তুকদের মধ্যে আছে বানর। এরাও মহর্ষির অন্তরংগ কম নয়। নন্দী ক্ষুধা পেলেই মহর্ষির কোলে এসে বসে থাকে। প্রসাদ পাবার জন্য দলবলকে ডেকে এনে হাজির ক'রে। দলগত সংঘর্ষ অনিবার্য হ'য়ে উঠ্‌লে প্রায়ই বানরের দল মহর্ষির মধ্যস্থতার জন্য আসে। মহর্ষির নিজের ধারণা বানরেরা তাঁকে তাদেরই একজন বলে মনে করে। হয়তো বা এটা নিছক রহস্যেরই কথা কিন্তু যে সর্বভূতমহেশ্বরের ভাবটি মহর্ষি রমণের জীবনে সর্বাবস্থায় হ'য়ে আছে মূর্ত, তার ইংগিত এর মধ্যেও আছে। কাঠবিড়ালীরা নিঃসংকোচে মহর্ষির কাছে আনাগোনা করে। মহর্ষি যে তাদেরও একান্ত আপন, এ স্বীকৃতি তাদের নিঃশংক ব্যবহারেও সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। শিশুগুলি তাঁর মাহাত্ম্যের

কোন সংবাদ না রেখেই খেলা ফেলে কাছে এসে প্রহরের পর প্রহর হৃষ্টচিত্তে কোন্ প্রলোভনে থাকে বসে—কে বল্‌বে? এমন কি বনের পাখীরা, কাকেরা পর্যন্ত অসংকোচে মহর্ষির হাত থেকে খাদ্য গ্রহণ কর্‌তে হ'য়ে উঠেছে অভ্যস্ত।

এ অঞ্চলে বিষধর সর্পের অভাব নেই। রমণাশ্রমের আশে পাশে এদের আবির্ভাব প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নিঃশব্দ অতিথির মত যে ভাবে এরা যাওয়া আসা করে, তাতে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে মহর্ষির অহিংসাবৃত্তির কাছে এরাও নতি স্বীকার ক'রে হ'য়ে উঠেছে অহিংস। বিছার কামড়ে মহর্ষি কিছুমাত্র বেদনাবোধ করেন নি—এমন দৃষ্টান্ত কয়েকবারই ঘটেছে। পরিভ্রমণ কালে একবার মহর্ষি এক ঝাঁক ভীমরুলের দ্বারা আক্রান্ত হ'ন। তাদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে তাঁর একটি পায়। নির্বিকার মহর্ষি হাসিমুখে তাদের অত্যাচার সহ্য ক'রে বল্‌লেন—"ঠিকই হয়েছে। অপরাধ করেছে আমার এই পা। অন্যমনস্ক ভাবে চল্‌তে চল্‌তে না জেনে আঘাত করেছে ওদের বাসায়। শাস্তি পাওয়াই ত এর উচিত।"

এই বিচিত্র জীবনযাত্রার বিস্ময়কর পটভূমিকায় সহজ মানুষ মহর্ষি রমণকে আমরা দেখি। দীনহীন কৌপীনধারী অতি সাধারণ একজন সাধুর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা হ'তে এমন কোন একটা বিভিন্নতা চোখে পড়েনা যা দিয়ে বিশেষ ভাবে তাঁকে চিহ্নিত ক'রে নেওয়া যায়। আশ্রম পালিত

জীবজন্তুগুলির তত্ত্বাবধান, উদ্যানের পরিচর্যা থেকে আরম্ভ ক'রে রন্ধন কার্য, তরকারীর খোসা ছাড়ানো পর্যন্ত তিনি নিজের হাতে করতে অভ্যস্ত। চিঠিপত্র পড়া, প্রুফ্ দেখে দেওয়ার কাজেও তাঁর অবহেলা নেই। শিষ্য বল্‌তে বা—বিশেষ ভাবে আপন বল্‌তে তাঁর কেউ নেই। যারা আসে সবাই তাঁর আপন অথবা সবাই তাঁর আত্মস্বরূপের আর একটি রূপ। কোন লোককে স্বমতে আনয়ন করবার প্রয়োজন তাঁর নেই। তর্ক যুক্তির প্রয়োগ করা ও মনে চমক লাগাবার কিছুমাত্র আয়োজনও নেই। যারা আসে স্বেচ্ছায় আসে; প্রয়োজন মিটে গেলে নিঃশব্দে চলে যায়। যে কয়দিন থাকে আতিথ্যের কোন ত্রুটী ঘটে না। মহর্ষির দৈনিক আহার কার্য সম্পন্ন হয় সবাইকার সংগে বসে। কোথাও কোন বাধা নেই, কোনখানে নেই কোন আবরণ। আড়ম্বরও নেই, বিধিনিষেধের ঘটাও নেই। যারা একাদিক্রমে বহুদিন যাবৎ আশ্রমজীবন অবলম্বন ক'রে মহর্ষির সংগ করছে তারাও জানে যে এত কাছাকাছি যে মানুষটি তাদের প্রতিদিনের দৃষ্টির সাম্‌নে উন্মুক্ত হ'য়ে আছে, অত্যন্ত কাছে থেকেও সে যেন কেমন ক'রে রয়ে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যারা আসে যায় তারাও এই বোধটি নিয়ে ফিরে যায় যে, এই দুর্লভ-দর্শন মানুষটির মাঝে এমন একটা কি আছে, যা বুদ্ধি দিয়ে যায় না বোঝা, জ্ঞানদিয়ে যায় না জানা। মনে হয় যেন মানুষের যত কিছু

ভাবনা, যত কিছু সমস্যা যত কিছু প্রশ্ন তার শেষ মীমাংসা এখানে হ'য়ে গেছে। নিজের জন্য মহর্ষির আর চাইবারও নেই কিছু, পাবারও নেই কিছু।

এই প্রসংগে যে কথাটি স্বতই মনে জাগে সেটি হ'ল এই : চাইবারও যাঁর কিছু নেই, পাবারও যাঁর বাকি কিছু নেই—তিনি এতগুলি বৎসর ধ'রে ঐ এক জায়গায় আছেন কি নিয়ে? এই প্রশ্নটির উত্তর ঠিকভাবে পেতে হ'লে মহর্ষির জীবন ধারা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। অতি অল্প বয়সে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে সংসার ত্যাগ ক'রে তিনি অরুণাচলে এলেন চলে। বিচারের অবসর ছিলো না—সংসার ভালো কি মন্দ। ঐটুকু বয়সে তথাকথিত বৈরাগ্যেরও যেমন কোন অর্থ ছিলো না—তেমনি আবার সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রতি বিরক্তিরও ছিলো না কোন হেতু। অতএব সংসার-বিরাগীরূপে তাঁকে দেখ্‌লে ভুল দেখা হয়। গৃহত্যাগের মূলে ছিল অনুরাগ—আত্মবস্তুর দুর্বার আকর্ষণ। সংসার পীড়িত মানুষ, যে সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করতে না পেরে অতৃপ্ত বাসনার মধ্যে বৈরাগ্যের ছলে পলাতক বৃত্তি অবলম্বন করে, তার সংগে মহর্ষির কোনখানে কোন মিল নেই। অশান্তিকে পিছনে ফেলে শান্তির সন্ধানে যাত্রা তিনি করেন নি। এড়িয়ে যাবার, পালিয়ে যাবার, মুক্তি পাবার—কোন কথাই ছিলো না। নিজ অন্তরের মধ্যে যে দিক দিয়ে এসেছে আনন্দের ডাক—সংসারের

প্রতি অটুট শ্রদ্ধা বজায় রেখেও সেই পথেই করেছেন তিনি প্রয়াণ। কাজেই শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত উদাসীনতার মধ্যেও এই ভাবটিই র'য়ে গেছে তাঁর মধ্যে প্রবল হ'য়ে। তাই যখনি কেউ সংসার ছেড়ে বৈরাগ্যের পথে যাত্রা করার সংকল্প জানাতে আসে, সম্মতি জানাবার আগে তিনি তার ভিতরটি দেখেন অনুসন্ধান করে, সাবধান ক'রে দেন এই বলে যে কর্মত্যাগ বা লোকালয় বর্জন কর্লেই শান্তির পথটি ধরা দেবে না। নিরাসক্তি যে নিরানন্দের নামান্তর নয় এই কথাটাই তিনি বলেছেন। বৈরাগ্যের ছলে কর্মবিমুখতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। সেবার পথকে, কর্মের পথকে তিনি ধর্মপথের সোপান হিসাবেই দিয়েছেন মর্যাদা।

দৃষ্টান্ত হিসাবে জনৈক শিক্ষকের কথাটি এখানে বলা যায়। আধ্যাত্মিকতার লালসা ভদ্রলোকটিকে পেয়ে বসেছিলো। মহর্ষিকে দেখে তিনি সিদ্ধান্ত ক'রে নিলেন যে অনুরূপ অবস্থা তাঁর নিজের পক্ষেও হয়তো বা দুষ্প্রাপ্য নয়। বৈরাগ্যের সাধনায় হ'লেন নিযুক্ত। সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিলনা— অতএব বৈরাগ্যের ইন্ধনের অভাব ছিলো না। প্রতিকারহীন অভাবের তাড়নায়, দৈনন্দিন দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্তি পাবার পন্থা হিসাবে সন্ন্যাসকে মনে হ'ল লোভনীয়। এই আত্মপ্রবঞ্চনা-মূলক, পলায়নপর মনোবৃত্তিকেই তিনি ভাব্লেন বৈরাগ্য। ভাব্লেন সংসার ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেই যেটুকু

বাকি আছে তাও অনায়াসে হ'য়ে যাবে। তবু যাবার আগে কি ভেবে একবার মহর্ষি কাছে গিয়ে জান্‌তে চাইলেন তাঁর অভিমত। মহর্ষির তখন বৃক্ষপত্র গেঁথে গেঁথে আশ্রমের জন্য ভোজন পাত্র নির্মাণে রত ছিলেন। প্রশ্নটি না শুনেই হাস্‌লেন। বল্‌লেন—"এই দেখো, পাতা গেঁথে গেঁথে থালা তৈরি করা কত হ্যাংগামের কাজ। পাতার থালায় লোকের খাওয়া যেই শেষ হবে তখনি এর প্রয়োজনও হবে শেষ। একে ফেলে দিতে হবে জেনেও—উদ্দেশ্যের দিকে চেয়ে, কত যত্নে কত অধ্যবসায়ে নির্মাতা এগুলি তৈরি করে। দেহ ধারণেরও তেমনি একটা উদ্দেশ্য আছে। আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তাকেও রাখতে হয় যত্ন ক'রে।" মাষ্টারমশাই কথাটি বুঝ্‌লেন। তাঁর ভ্রম ভাঙলো।

এমনি ধরণের সাময়িক বৈরাগ্য নিয়ে কত লোকই আসে, আবার ফিরে যায় শান্ত হ'য়ে, সুস্থ হ'য়ে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোক ছাড়াও সত্যিকারের মুমুক্ষু অন্তর নিয়ে যাঁরা আসেন তাঁদের সংখ্যা হয়তো বেশি নয়। নটেশা মুদালিয়ার এই শ্রেণীর এক সত্যিকারের পিপাসু। ইনিও এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছেলেবেলা থেকেই এঁর মনের গতিটা ছিল অসাংসারিক—পরম প্রাপ্তির আকাংখায় উন্মুখ। বিবেকানন্দের বইগুলি নিষ্ঠার সংগে পড়্‌তে পড়্‌তে মনটি উঠেছিল কানায় কানায় ভরে। গুরুলাভের সংকল্প নিয়ে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি মহর্ষির

সন্নিধানে এসে হাজির হ'লেন। কয়েকদিন নিয়মিত ভাবে আশ্রমে যাতায়াত করলেন, কিন্তু মনের কথাটি নিবেদন করবার সুযোগ মিললো না। নিতান্ত হতাশ হ'য়ে এলেন ফিরে। যেখানে যত সাধু সন্ন্যাসীর খবর পান, একে একে দর্শন ক'রে আসেন। মন যেন কোথাও ধরা দিতে চায় না। ঘুরে ফিরে মনে আসে মহর্ষির ছবিটি। এমনি ক'রে আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে কাট্‌লো দু'টি বছর। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নাটেশা মহর্ষিকে লিখ্‌লেন একখানি বিস্তারিত লিপি। উত্তর না পেয়ে আবার একখানি চিঠি লিখ্‌লেন। তাতে জানালেন—"জন্ম জন্মান্তর যদি আমাকে ফিরে ফিরে আস্‌তে হয় তাও স্বীকার, আমি আপনার কাছে উপদেশ না নিয়ে ছাড়্‌ছি না। অযোগ্য বোধে যদি এজন্মে আমাকে আপনি স্বীকার না করেন, আমার জন্য পুনরায় জন্ম বিড়ম্বনা আপনাকেও সহ্য করতে হবে। আমার এ শপথ মিথ্যা হবে না।" পত্রোত্তর এলো না—কিন্তু এলো অপূর্ব এক স্বপ্নাদেশ। এর সামান্য কয়েকদিন পরেই আশ্রম থেকে লেখা একখানি পত্রে মহর্ষি সন্দর্শনের আহ্বান এলো।

পুলকিত চিত্তে নাটেশা মহর্ষি সন্নিধানে এসে হাজির। আবার দিনের পরে দিন আসেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে নিঃশব্দে, ব্যর্থতার বোঝা ব'য়ে ফিরে চলে যান। বছর খানেক কাট্‌লো এই ভাবে। বহু-আকাংখিত সুযোগ সহসা একদিন এসে

হাজির হ'ল। সাহসে ভর ক'রে নাটেশা একদিন মুখ খুল্‌লেন "আমি তোমার অনুগ্রহের প্রার্থী। কাকে বলে অনুগ্রহ তাই জান্‌তে চাই।" প্রত্যুত্তরে মহর্ষি বল্‌লেন—"অনুগ্রহ দেওয়াই আছে। তুমি যদি নিতে না পারো আমি কি করতে পারি?" নাটেশা শুনে চলে এলেন। কতকটা বুঝ্‌লেন—কতকটা বুঝ্‌লেন না। কি এই অনুগ্রহ? মৌনের মাঝে মহর্ষির কোন্ অনুগ্রহ-স্বরূপটি আছে বিকশিত হ'য়ে?

উত্তর এলো; পত্রে নয়, স্বপ্নে। মনে হ'ল মহর্ষির দয়া তিনি পেয়েছেন; দীক্ষা লাভেও তিনি বঞ্চিত হ'ন নি। কিন্তু তবু যেন পিপাসার শান্তি হ'ল না। অশান্ত প্রাণে পুনরায় গেলেন মহর্ষির কাছে ছুটে। সেখানে কয়েকজন ভক্তের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোচনা চল্‌ছিলো। তার কিছু কিছু নাটেশার কানে গেল। মনে হ'ল এ যেন এক বিস্ময়কর অজ্ঞাত জগতের অপরিজ্ঞাত আভাস। যে সব কথা তিনি এখনো শোনেন নি, যে সব সম্ভাবনা তাঁর মনে কখনো উদয় হয় নি—এরা যেন কি আশ্চর্য শক্তিবলে সে সব এমন একান্ত ভাবে নিয়েছে জেনে। নাটেশা বিষন্ন চিত্তে ভাব্‌তে লাগলেন—"কবে আর এই সব আমার জানার সময় হবে? সারা জীবন ধ'রে জমিয়ে তুলেছি কেবল নিরাশার বোঝা! এ জন্মটাই কি যাবে আমার এমনি ক'রে ব্যর্থ হ'য়ে?"

এই বেদনার পরম ক্ষণটিকে মহর্ষি অবহেলা করতে পারলেন না। নাটেশাকে একান্তে ডেকে বললেন—"কিসের এত দুশ্চিন্তা তোমার? অনুসন্ধানের বস্তুটি র'য়েছে হাতের কাছেই। নিত্য সত্য সে বস্তু। যা আছেই, যা চিরন্তন তার জন্য চিন্তার কি আছে? কেমন ক'রে তুমি জানলে যে পাওয়া তোমার হয় নি, প্রার্থিত ধন তোমার করতলগত নয়? আজ যেখানে দ্বিধা আছে, কাল সেখানে আসবে নিশ্চয়তা। নিরাশার হেতু কোথায়? সত্যসত্যই যদি তুমি অযোগ্য হ'তে—তা'হলে এত সাধুসংগের বাসনাই বা তোমার জাগবে কেন?" কথাগুলি শুনে নাটেশার মনে হ'ল যেন তাঁর এতদিনের সমস্ত ব্যথা এক মুহূর্তে গেছে জুড়িয়ে।

এর পরে নাটেশার জীবনে যে পরম পরিণতির স্রোতটি এসে উপনীত হ'ল তার বিবরণ কোন ইতিহাসের বিষয় নয়। মহর্ষির অনুগ্রহে অবগাহন ক'রে তাঁর যে রূপান্তর ঘটেছিলো তাও চোখে দেখার ব্যাপার নয়। কিন্তু নাটেশার নিজের কথায় লিপিবদ্ধ প্রমাণ আছে যে তাঁর পিপাসার শান্তি হয়েছিলো। অনুগ্রহের প্রার্থনা নিয়ে তিনি যে শূন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে মহর্ষির দ্বারস্থ হয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত কানায় কানায় ভ'রে উঠেছিল—এইটুকুই কেবল নিশ্চিত ভাবে জানা যায়।

এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় রমানাথিয়ারের নাম। প্রথম জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও

বাণী যত্নসহকারে পাঠ ক'রে এরও প্রাণে জেগেছিল অসীমের তৃষ্ণা। ছুটির দিনে রমণাশ্রমে এসে বসে থাক্‌তেন। এইভাবে হ'ল সূত্রপাত। ধীরে ধীরে মন গেল মেতে। রমানাথিয়ারের জীবনে এলো দুকুলপ্লাবী বন্যা—ভাসিয়ে নিয়ে গেল সমাজ-সংস্কারময় অতীত জীবনের ভালোমন্দ সব কিছু। স্ত্রী ও শিশু-সন্তানগুলি সমেত সমস্ত সংসারটিই গেল তাঁর কাছে অর্থহীন হ'য়ে। দায়িত্বজ্ঞানের যে বন্ধনটি সংসারে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছিলো ধীরে ধীরে গেল সেটি খুলে। রমানাথিয়ার সমস্ত ছেড়ে তপশ্চর্যায় গেলেন ডুবে। রমণাশ্রমে এসে নির্বাক হ'য়ে চুপ ক'রে বসে থাক্‌তেন। কারুর সংগে ছিল না বাক্যালাপ। এমন কি মহর্ষির সংগেও নয়। কোথায় চলে যান, কি করেন, কিছুরই নেই ঠিক। মাঝে মাঝে গৃহে যান, কয়েকদিন কলের পুতুলের মত কাজকর্ম করেন—আবার উধাও হ'য়ে যান। পরণের কাপড়টি পর্যন্ত কখনো থাকে, কখনো খ'সে পড়ে যায়। আশ্রমের লোকজন এই উলংগ সন্ন্যাসীকে নিয়ে বিব্রত হ'য়ে পড়্‌লেন। সবাই মিলে ধ'রে বেঁধে কিছুদিন আশ্রমের একটি ঘরে এঁকে পুরে রেখে দিল। কিন্তু খোলা পেয়েই আবার মুক্ত পুরুষের মত অবাধ জীবনযাত্রা চালাতে লাগলেন। একগলা জলে ডুবে আশ্রম-সন্নিহিত জলাশয়ে ধ্যানস্থ হ'য়ে সারারাত্রি কাটিয়ে দিতেন। শেষ জীবনে এই আত্মসমাহিত মৌন তপস্বীর কি পরিণতি হ'ল তা জান্‌বার উপায় নেই। কিন্তু যেটুকু

জানা গেছে তাতেই বোঝা যায় যে, ইনি নিজের মধ্যে পরমতম সমর্পণের কেন্দ্রটি পেয়েছেন খুঁজে।

মহর্ষি রমণের বিশিষ্ট ভক্তরূপে যে কয়েকজনের নাম বা বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব হ'ল, বলা বাহুল্য যে তারাই সব নয়। বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে যে অগণিত তীর্থযাত্রী অরুণাচল পর্বতের জাগ্রত দেবতার দর্শণ মানসে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন—তাদের কতটুকু পরিচয়ই বা আমরা জানি! তা ছাড়া প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্তির পথটি নিজস্ব স্বকীয়তায় এমনি রহস্যাবৃত যে বাইরের দৃষ্টি দিয়ে এর কোন হিসাবই পাওয়া যায় না। বিরাট পুরুষ যোগী রামীয়া সমাধি লাভান্তে, শেষ সন্দেহ মোচনের অভি-প্রায়ে নিলেন মহর্ষির শরণ। অখণ্ড চৈতন্যের মাঝে যখন তাঁর উপলব্ধির সীমানায় দ্রষ্টা এবং দৃশ্য মিলিয়ে একাকার হ'য়ে গেল—আত্মজিজ্ঞাসার চরমতম সমস্যাটি তখন তাঁর মনে জাগালো প্রশ্ন। মীমাংসার জন্য পণ্ডিতদের কাছে অনেক ঘোরাঘুরি কর্‌লেন—কিন্তু মনের মত উত্তরটি পেলেন না কারো কাছে। তাঁরা বল্‌লেন—"এ আবার কেমন কথা? সাধারণ বুদ্ধিতেই ত বোঝা যায় যে, দ্রষ্টা আর দৃশ্য পৃথক বস্তু। তারা আবার এক হ'য়ে যায়—এ কোন্ পাগলের কথা!" যোগী রামীয়া নিজের উপলব্ধির সত্যটিকে অকম্পিত দীপশিখার মত ক'রে নিজের অন্তরে আচ্ছাদন ক'রে সত্যদ্রষ্টার সন্ধানে মহর্ষির কাছে এলেন। মহর্ষি বল্‌লেন—"তোমার ভুল হয় নি। সাধারণ

দৃষ্টিতে দ্রষ্টা আর দৃশ্য বিভিন্ন ভাবেই প্রতীয়মান হয়। যোগ-দৃষ্টিতে, ভাবঘন চৈতন্য-সত্বায় অবস্থিতিকালে, সমস্ত পার্থক্য মুছে গিয়ে সব একাকার হ'য়ে যায়।" এই একটি কথায় দুজন দুজনকে নিলেন চিনে। দেয় যা ছিল দিলেন মহর্ষি, প্রাপ্য যা ছিল পেলেন যোগী রামীয়া।

আরও একজন পরম তপস্বী সারাজীবনের অক্লান্ত তপশ্চর্যার প্রচুর ঐশ্বর্যভার নিয়ে, জীবন সায়াহ্নে এসে উপনীত হ'লেন মহর্ষির দ্বারে। এঁর নাম শুদ্ধানন্দ ভারতী। তামিল সাহিত্যে অসাধারণ দান এঁর। সাংবাদিক মহলে ও শিক্ষাপ্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাও ছিল এঁর অসাধারণ। জ্ঞানে কর্মে অমিত পরাক্রান্ত এই বিরাট মানুষটি ছিলেন শক্তির আধার। এমন ধর্ম মত নেই যার পরিপূর্ণ অনুশীলন ইঁনি করেন নি। তপস্যার ফলও ইঁনি লাভ করেছিলেন পরিপূর্ণ মাত্রায়। হয়তো বা শেষটুকুই ছিল বাকি। জীবনের গোধুলি লগ্নে তারই দাবী নিয়ে এলেন ইঁনি মহর্ষির কাছে। জিজ্ঞাসার কিছু ছিল না। মহর্ষি অতি সমাদরে এঁকে গ্রহণ করলেন। মহর্ষির সংস্পর্শে এসে হয়তো বা এঁর মনের শেষ আবরণটুকুও গেল বিনষ্ট হ'য়ে। এর পরে শুদ্ধানন্দ ভারতী নামে যে মানুষটিকে আমরা দেখি—সে যেন এক নূতন মানুষ। অহংজ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে এতদূরেই তিনি চলে গেছেন যে কথায় বা কাজে—নিজেকে 'আমি' বলে অভিহিত করতেও তিনি কুণ্ঠিত হ'তেন।

মহর্ষি রমণের জীবনকাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে প্রসংগক্রমে যে সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ মানুষের বিবরণ উধৃত করা হ'ল—তাদের অধিকাংশের পরিচয় একমাত্র মহর্ষিরই পরিচায়ক। মহর্ষি এদের জীবনে কোন না কোন উপলক্ষে এসে উদয় হ'য়েছেন বলেই তাঁর জীবন কাহিনীতে এরা গেছে এমন ভাবে জড়িয়ে। এদের কথা বাদ দিলে মহর্ষির সম্বন্ধে বলারই যেমন বিশেষ কিছু থাকে না, তেমনি আবার মহর্ষির কথা বাদ দিলে এদের সম্বন্ধেও থাকে না বলার মত কোন কথা। অলৌকিক ঘটনা বল্‌তে যা আমরা সাধারণতঃ বুঝি মহর্ষির জীবনে তার দৃষ্টান্ত নেই—অথচ মানুষ সচরাচর সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যা চায় তা প্রধানত এই বস্তুই। এদিক দিয়ে, মহর্ষির জীবনে, এক হিসাবে, আকর্ষণের কিছুই নেই। মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানকে অবলম্বন ক'রে নেই কোনরূপ শক্তির খেলা। মহর্ষি যে ইচ্ছা ক'রে কোনদিন কারো রোগ সারিয়েছেন কি অভিষ্ট পূরণে সহায়তা করেছেন—এমনতর কৃতিত্বেরও নেই কোন নিদর্শন। তবু এই অনাড়ম্বর অনাসক্ত জীবনটির চারিপাশে কি যেন এক অলৌকিক সম্মোহনের মধুচক্র উঠেছে গ'ড়ে, যার জালে জড়িয়ে গেছে এতগুলি বিভিন্নধর্মী মানুষ। গড়ে উঠেছে এক মহামুক্তির সমন্বয়-তীর্থ, যেখানে না আছে সংস্কার না আছে তথাকথিত ধর্মমতের সংকীর্ণ গণ্ডী; ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, বিদ্বানে মুর্খে, জ্ঞানে অজ্ঞানে মিলে মিশে গেছে একাকার হ'য়ে।

এই হ'ল মহর্ষি রমণ, যাঁর মধ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য লাভ করেছে নবজীবন—চিরদিনের তপোবন হ'য়ে উঠেছে রূপায়িত। সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে এ যেন সেই চিরন্তন সূর্যেরই অভ্যুদয়। প্রতিদিবসের পটভূমিকায় এই অলৌকিক আবির্ভাবটিকে বিস্ময়কর ব'লে হয়তো বা মনে হয় না কিন্তু চোখ মেলে যারা দেখে তারা ব'লে অন্য কথা। অনন্ত পারের আলো এসে পড়ে কোথাকার এক নিভৃত প্রান্তরের এক ফালি শ্যামলতার বুকে। অমনি জেগে ওঠে ঊর্ধলোকে মুখ তুলে নামহীন গোত্রহীন বনফুল। কলরব ক'রে সাড়া দেয় পাখীর দল। দৃষ্টির দ্বার যায় খুলে। সৃষ্টির অন্তরে লাগে দোলা। চোখ মুদে যারা থাকে অথবা যারা জন্মান্ধ তারা এ সমারোহের অর্থ খুঁজে পায় না। কেবল যারা চক্ষুষ্মান তারাই দিকে দিগন্তরে বিস্মিত, মুগ্ধ, পরিতৃপ্ত দৃষ্টি দিয়ে আকর্ষণ ক'রে নেয় এই প্রাণময় আলোকের অমৃতধারা।

হাম্‌ফ্রিসের পরিচয় ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি। ভারতবর্ষের বাইরে মহর্ষির সৌরভ তিনিই এনেছিলেন বহন করে। ১৯১১খৃষ্টাব্দে ছোট একখানি সুমুদ্রিত পুস্তিকায় হাম্‌ফ্রিসের সংগৃহীত বিবরণ হয়েছিল প্রকাশিত। দেশান্তরের মানব সমাজের কাছে মহর্ষি রমণকে চিনিয়ে দেবার মত সুপ্রচুর উপকরণ তার মধ্যে হয়তো ছিলো না; কিন্তু যেটুকু ছিল

ইংগিত হিসাবে তার মূল্য বড় কম নয়। মৌমাছির পায়ে পরাগ-রেণু যতটুকু ধরে, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ততটুকুই হ'য়ে ওঠে যথেষ্ট। অথচ প্রাণসংক্রামনের এই রহস্য কোন মৌমাছিরই জান্‌বার কথা নয়। অমৃতের তৃষ্ণা যাকে পেয়ে বসে সে বুঝি নিজেরই অজ্ঞাতসারে এমনি ভাবে জড়িয়ে পড়ে সৃষ্টিধারার নিগুঢ় ষড়যন্ত্রে। নইলে এ পারম্পর্যগুলিই বা ঘটে কোন্ হিসাবে? হাম্‌ফ্রিসের বান্ধবী, যাঁর পরিচয় কিছুই নেই জানা, তিনি যে কিসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে মহর্ষির পরিচয়টি ছাপান অক্ষরে লোকসমাজে প্রচার কর্‌লেন, এও এক রহস্য। অকিঞ্চিৎকর এই ইংগিতটুকুকেই অবলম্বন ক'রে ক্লান্ত রজনীর বহু পর্যটক অরুণাচলের আলোক-তীর্থে এসে আত্মস্বরূপের নির্ভয় লোকে পেয়েছেন আশ্রয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল রমণাশ্রমের উদ্‌যোগে মহর্ষির প্রথম জীবন কাহিনী। নরসিংহ স্বামী রচিত এই জীবনীটি আয়তনে স্বল্প হ'লেও বিশেষ গুরত্বপূর্ণ; কারণ এই প্রথম লোকসমক্ষে প্রচারিত হ'ল এই মহামৌনীর জীবন বেদ। এই বইখানিরই একখণ্ড গিয়ে পড়লো, প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, সমালোচনার জন্য পল্ ব্রাণ্টনের হাতে। সাংবাদিক, সহিত্যিক ও সমালোচক হিসাবে পল্ ব্রাণ্টনের খ্যাতি ছিল। মন-স্তত্ব যাদু-বিদ্যা প্রেত-তত্ব ইত্যাদি নানারকমের ব্যাপারে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। পর্যটক হিসাবেও খুব নগণ্য

তিনি ছিলেন না। আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখবার অভিপ্রায়ে ইতিপূর্বেই তিনি এদেশে একবার এসেছিলেন। মহর্ষি-সাক্ষাৎকারের স্মৃতিটি ছিল মনের মধ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে। তাই গ্রন্থ সমালোচনা সূত্রে, উচ্ছ্বসিত ভাষায়, মহর্ষি প্রসঙ্গে তিনি লিখ্‌লেন—"প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে যদি কোনদিন কেউ নির্বাণের শীর্ষে আরোহণ ক'রে থাকেন, নিজের অভিজ্ঞতার নিঃসন্দিগ্ধতা থেকে আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি যে মহর্ষি রমণ তাঁদের অন্যতম।"

ডক্টর পল্ ব্রাণ্টনের নিজের লেখা বিবরণ থেকে মহর্ষির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের যে কাহিনী পাওয়া যায় সেটি নানা দিক দিয়ে কৌতুহলোদ্দীপক। রচনা হিসাবে সেটি যে সার্থক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া বিদেশীর চোখে মহর্ষির যে রূপটি উদার সার্বজনীনতায় ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে সেটিও উপভোগ্য বড় কম। সেইজন্যই কাহিনীটি আগাগোড়া সংক্ষেপে তুলে দিলে ভাল হয়।

ডক্টর পল্ ব্রাণ্টনের ভারতবর্ষে আসার মূলে ছিল আশৈশব সঞ্চিত স্বতস্ফূর্ত প্রেরণা। জন্মান্তরের সংস্কারের মত কি যেন একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ ছিল তাঁর মনে। ভারতের নদী গিরি বন, দুর্ভেদ্য চিরতুষারময় নির্জনতা, দিগন্ত বিস্তৃত শৈলমালা, যুগযুগান্তের রহস্যাবৃত বনভূমি, দেবভাষার ধ্বনি, বেদমন্ত্রের অপরূপ ঝংকার, প্রাচীন সভ্যতার সুমহান ঐতিহ্য এই

সমস্তগুলি মিলে তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল এক অদৃষ্টপূর্ব স্বপ্নময় পরিমণ্ডল। ভারতবর্ষের কোন কিছু না জেনেই কেমন ক'রে যেন তাঁর মনের মধ্যে ধারণাটি হ'য়ে উঠেছিল বদ্ধমূল যে ইউরোপীয় পর্যটকদের প্রত্যক্ষ বর্ণনায় ভারতের যে রূপটি চোখে পড়ে তার আড়ালে রয়ে গেছে আর একটি নিভৃত ভারতবর্ষ যাকে চোখে যায় না দেখা, কানে যায় না শোনা। সেই অপ্রত্যক্ষ দেবভূমি যুগযুগান্ত ধরে; প্রবহমান কালস্রোতের গ্রাস হ'তে সযত্নে রক্ষা ক'রে আস্‌ছে ভারতের নিজস্ব অধ্যাত্ম রত্ন, যার হ্রাস নেই, ক্ষয় নেই, নেই কোন বিবর্তন। মানচিত্রের ত্রিকোনাকার স্থলভাগটির পানে চেয়ে কত বিস্ময়কর অভিযানের রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের স্বপ্নই যে তিনি দেখতেন তার সীমা সংখ্যা নেই। ভুগোলের খোলা পাতাগুলি দেখতে দেখতে হ'য়ে যেতো অস্পষ্ট; আর সেই ঝাপ্‌সা কুয়াশায় তিনি দেখ্‌তেন, গিরি-গুহা, পর্বতচূড়া—অরণ্যানীর অপরূপ রেখাচিত্র। তাঁর মনে হ'ত সন্ধানী দৃষ্টির অপেক্ষায় এই অলক্ষ্য মায়াপুরী যেমন তাঁর পথ চেয়ে আছে তেমনি আছেন যত তেজঃপুঞ্জ-কলেবর মুণি, ঋষি, যোগী সন্ন্যাসী। মনে হ'ত এই তপস্যাভূমির আসল রূপটি যারা দেখেনি—তারাই কেবল দুর্ভাগ্যের বোঝা ব'য়ে, খালি দুটো চোখ দিয়ে, মহাদেশটিকে দেখে বেড়িয়েছে আর শেষ পর্যন্ত ভ্রমণকাহিনী লিখে পূর্ণ ক'রেছে তাদের বিড়ম্বনা। সত্য ভারতবর্ষ—জীবন্ত ভারতবর্ষ

গবেষণার বস্তু নয় উপলব্ধির বস্তু। তাকে দেখতে হয় অন্তর দিয়ে, বুঝতে হয় অনুভূতি দিয়ে, জানতে হয় প্রাণ দিয়ে। পল্ ব্রাণ্টন্‌কে পেয়ে বসলো এই বিচিত্র উন্মাদনা। তারুণ্যের পরিপূর্ণ উৎসাহে অভিযানের পরিকল্পনাটি উঠ্‌লো গড়ে; আশানুরূপ পরিসমাপ্তি যে ঘট্‌লো না সেটাও হয়তো বা তারুণ্যেরই বিড়ম্বনা।

মৎলবটা ছিল খুবই সোজা। চলার জন্য দু'খানি পা যখন আছেই তখন এসিয়া মাইনর হ'য়ে, আরব দেশ হ'য়ে এডেন বন্দরে উপনীত হওয়াটা আর কঠিন কি? পথ খরচের জন্য সামান্য কিছু টাকা, সেও একরকম ক'রে যোগাড় হ'য়ে গেল। একা একা ঠিক জমে না বলে সহপাঠী আর এক কল্পনাবিলাসী বন্ধুকেও নিয়েছিলেন যোগাড় ক'রে। তারপর —এডেন্ বন্দরে একবার পৌঁছে গেলে অসুবিধা আর রইলো কি? সেখান থেকে যেসব জাহাজ ভারতবর্ষে নিত্য যাতায়াত ক'রে তাদেরই একজন সদয়হৃদয় কাপ্তেনকে কি আর রাজী করা কঠিন হবে? এরপরে ভারতবর্ষ আর কতদূরের পথ? বড় জোর সাতটি দিন লাগবে সেখানে পৌঁছাতে। সবই ঠিক ছিলো কিন্তু ভাগ্য ছিলেন বিরূপ। বাস্তবতা এলো সঙ্গী বালকটির নিষ্ঠুর অভিভাবকের রূপে। ব্যবস্থাটি গেল ভেস্তে। এডেন্ বন্দরের সহৃদয় কাপ্তেনগুলি পূর্বের মতই জাহাজ ভাসিয়ে এপার ওপার করতে লাগলো। পল্ ব্রাণ্টনের

ভারতাভিযান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রইলো। নিঃশব্দে বাড়তে লাগলো তাঁর বয়স।

সঙ্কল্প যদি মূর্ত হ'য়ে ওঠে তাকে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায় না। তারই ফলে তাঁর জীবনে এসে আবির্ভূত হ'লেন লণ্ডনপ্রবাসী এক বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ। পুরানো বইয়ের দোকানে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এই লোকটিকে হঠাৎ পেয়ে গেলেন পল্‌ ব্রাণ্টন্। দিনের পর দিন স্নেহে সাহচর্যে বন্ধনটি হ'য়ে উঠ্‌লো গাঢ় আত্মীয়তায় পরিণত। পল্‌ ব্রাণ্টনের যে মনটি নিভৃতে ভারতের বাণীর জন্য ছিল উৎকর্ণ হ'য়ে, অনেক দিনের তৃষ্ণার বারি পেয়ে সেও হ'ল পরিতৃপ্ত; সুপ্ত আগ্রহটি নূতন ক'রে উঠ্‌লো জেগে। শেষ পর্যন্ত ঐকান্তিক চাওয়ার বিনিময়ে একদিন কেমন ক'রে বহুপ্রার্থিত সুযোগটি এসে হাজির হ'ল—সে অনেক কথা। সমস্ত কথা বল্‌তে গেলে পল্‌ ব্রাণ্টনের গোটা জীবনীটাই এখানে তুলে দিতে হয়। সেটা সম্ভব নয় বলেই, অরুণাচলের পথে কেমন ক'রে তাঁর জীবনের পথটি সংযুক্ত হ'ল—সেই মূল কথাটাই কেবল এখানে বলা চলে। ভূমিকা স্বরূপ এইটুকুই শুধু উল্লেখ করা যায় যে, ঘটনার পারম্পর্যে এই মিলনটি যতোই স্বাভাবিক বলে মনে হোক না কেন—এ পরিণতিটি সহজ ভাবে ঘটা সম্ভব ছিলো না। বিভিন্ন জগতের ও বিপরীত শতাব্দীর দু'টি মানুষের পক্ষে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ব্যবধান পেরিয়ে কাছাকাছি

আসাটা ভাগ্যচক্রে অনিবার্য হ'লেও আয়াস-সাধ্য না হ'য়ে পারে না। পল্ ব্রাণ্টনের দিক থেকে যে আয়াসের ত্রুটী ছিল না—পর্যটনের অধ্যবসায়ে তার প্রমান আছে। যোগাযোগের সূত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে অনুকম্পার হাতখানি, হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতসারেই, আগন্তুক বিদেশীর পথ-নির্দেশের ছলে মহর্ষিও দিয়েছিলেন প্রসারিত ক'রে। নইলে, হয়তো বা এমনটি নাও ঘট্‌তে পার্‌তো।

প্রথম দর্শনে মহর্ষির চিত্রটি পল্ ব্রাণ্টনের দৃষ্টিতে যে ভাবে প্রতিভাত হ'য়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিজের লেখা বর্ণনায়। "মুহূর্তের দৃষ্টিপাতেই মনে হ'ল—ইনি যে মহর্ষি তাতে সন্দেহ নেই। শয্যাবেদীর উপরে ঋজুভাবে উপবিষ্ট মূর্তিটির পরনে কৌপীন ছাড়া আর কিছু নেই। গাত্রবর্ণ তাম্রাভ, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী হিসাবে ফর্সাই বলা চলে। দীর্ঘদেহ, বয়স মনে হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুডৌল উত্তমাংগের চুলগুলি ছোট ক'রে কাটা। উন্নত ও বিস্তৃত ললাটে মনীষার সুস্পষ্ট ছাপ। আকৃতির মধ্যে প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্যের আভাষটিই যেন প্রধানতঃ চোখে পড়ে। দৃষ্টি গভীর। চোখ দু'টি বাদামী, আয়তনে মাঝামাঝি এবং বিস্ফারিত। দেহ পাথরের মূর্তির মত স্থির; চাঞ্চল্যের আভাষ মাত্র নেই। আমাকে লক্ষ্য করেছেন কি না,

চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা অনুমান ক'রবার উপায় ছিল না। সে দৃষ্টি যেন কোন সুদূরপ্রশারী শূন্যে গিয়ে মিলিয়ে গেছে ঃ এতদূর—যে তাকে অসীমই বলা চলে। অনেকদিন ধ'রে আমার ধারণা ছিল যে মানুষের চোখ দেখে তার আত্মার পরিচয় জানা যায়। সে ধারণা ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল মহর্ষির চোখের সম্মুখে এসে।"

"প্রথমটা, ইউরোপীয়-সুলভ মনোবৃত্তি থেকে, এই কথাটাই আমার ক্ষণিকের জন্য মনে এসেছিল—যে ভক্তদের সমক্ষে আসর জমাবার কায়দাই বুঝি লোকটির এই! আমার মন যেন কথাটাকে আমলই দিল না। পরক্ষণে মনে হ'ল—'সমাধির তন্ময়তা কি শূন্য-গর্ভ ?' নিজের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর মিল্‌লো না। চুম্বক যেমন ক'রে লৌহ-কনাকে টেনে রাখে, তেমনি ক'রেই মানুষটি মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছে আমার সমগ্র চেতনাকে। কি এমন আছে এর মধ্যে যে চোখ ফেরাতে পারি না। প্রাথমিক বিস্ময়টা কেটে গিয়ে তার স্থানে এলো বিমুগ্ধ বিহ্বলতা। বহুক্ষণ পরে মনে হ'ল যেন নিঃশব্দ-প্রবাহে সেখানে চলেছে একটা পরিবর্তনের স্রোত। পথে আস্‌তে আস্‌তে যে প্রশ্নতালিকা তৈরি ক'রে রেখেছিলাম—একটি একটি ক'রে তারা মিলিয়ে গেল। মনে হ'ল সেগুলির উত্তর পেলেও যা, না পেলেও তাই। সমস্যাগুলির সমাধানে অসমাধানে আর আমার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। অনুভব

কর্‌লাম যেন আমার পাশ দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির নির্ঝর চলেছে ব'য়ে। আমার সত্বার নিভৃত কেন্দ্রগুলি শান্তিতে কানায় কানায় গেছে ভ'রে। চিন্তা-জর্জরিত মস্তিষ্কের কোষগুলি যেন এক অনির্বচনীয় প্রশান্তির স্পর্শ পেয়েছে। বহুদিনের অভ্যস্ত প্রশ্নগুলি হ'য়ে উঠ্‌লো নগন্যতায় অর্থহীন। পিছনে ফেলে আসা জীবনটি অকস্মাৎ হ'য়ে গেল নিরর্থক। সহসা যেন বুঝে নিলাম কি ভাবে বুদ্ধি সমস্যার বোঝা তৈরি ক'রে নিজের জালে নিজে জড়ায়, সমাধানের ছলে সৃষ্টি ক'রে নূতনতর দুঃখের জাল।"

নূতন ক'রে আর একবার মনে হ'ল—এই বুঝি তবে আধ্যাত্মিক সৌরভ। ফুলের পাপ্‌ড়িগুলি থেকে যেমন ক'রে সৌরভ পড়ে ছড়িয়ে, তেমনি ক'রেই বুঝি মহর্ষির চারি পাশে জড়িয়ে থাকে এই সুরভি। বিস্মিত হ'য়ে ভাব্‌তে লাগলাম—এ বস্তুর ধর্মই বুঝি এই যে, দাতা ও গ্রহিতা উভয়েরই অজ্ঞাতসারে অলৌকিক প্রভাবটি যায় বিস্তৃত হ'য়ে। বোধ হ'ল যেন সম্মুখে আমার দিগন্তবিস্তৃত অমৃতসিন্ধুর স্রোতে লেগেছে সুবাতাসের দোলা। পিছনেও গেছে নোঙরের বাঁধন শিথিল হ'য়ে।"

প্রথম দর্শনের এই পটভূমিকায়, প্রথম দিনের আলাপটি কৌতুহলোদ্দীপক। একে জানে না অন্যের ভাষা, অথচ জিজ্ঞাসাও আছে, উত্তরও চাই।

মহর্ষি তখন হাতে লেখা একখানি বাঁধানো বইয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে কি যেন লিখ্‌ছিলেন। লেখা থামিয়ে, জনৈক ভক্ত মারফৎ, পল্‌ ব্রাণ্টনের আহারাদির সুবিধা হ'য়েছে কি না জান্‌তে চাইলেন। উত্তর দিলেন পল্‌ ব্রাণ্টন্‌। সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের বেগে বলে গেলেন তাঁর নিজের যাবতীয় কথা—সারাজীবন ধ'রে যা চেয়েছেন, যা পেয়েছেন, যা করেছেন, যা ভেবেছেন সব কিছু। অভাব, অভিযোগ, অশান্তি, অপূর্ণতার সমস্যাগুলির সমষ্টি দিলেন একসঙ্গে নিবেদন ক'রে। বল্‌লেন 'শেষ প্রশ্নের মীমাংসা আমার মেলে নি। অভিজ্ঞতায় যার প্রমান পাওয়া যায় না, তা বিশ্বাস কর্‌তে আমার বাধে। ধার্মিক বল্‌তে যা বোঝায় তা আমি নই। মানুষের বাস্তবজীবনের বাইরে যদি কোন সত্বার অস্তিত্ব থাকে—তাকে আমি কোন্‌ উপায়ে কর্‌বো উপলব্ধি? পাশ্চাত্যের জ্ঞানে এ প্রশ্নের উত্তর নেই। আমি জান্‌তে চাই—কোথাও কি এর উত্তর নেই?' প্রশ্নটি শেষ হবার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌লো অখণ্ড নীরবতা। মহর্ষির দৃষ্টিতে পলক নেই। উৎকর্ণ হ'য়ে আছেন পল্‌ ব্রাণ্টন্‌।

প্রায় দশমিনিট পরে প্রতীক্ষিত উত্তর এলো। মহর্ষি বল্‌লেন—"তুমি বল্‌লে, আমি জান্‌তে চাই। আমায় বলো দেখি—কে এই 'আমি' যে জান্‌তে চায়।"

এ ধরণের প্রশ্নের জন্য পল্ ব্রাণ্টন্ প্রস্তুত ছিলেন না। 'কে এই আমি?' সে আবার কি কথা! উত্তর ত সাম্নেই হাজির। নূতন ক'রে বলার আছে কি! তাঁর বিমূঢ় ভাবটি লক্ষ্য ক'রে মহর্ষি আবার বল্লেন—'ভেবে দেখো আমিটা কে?' 'পল্ ব্রাণ্টন্ অংগুলি নির্দেশে নিজেকে দেখিয়ে দিলেন—নিজের নামটিও আবৃত্তি করলেন। স্মিতহাস্যে মহর্ষি বল্লেন—'ও ত তোমার দেহ মাত্র। তুমি কোথায়?' পল্ ব্রাণ্টন্ নিরুত্তরে ভাব্তে লাগলেন। মহর্ষি বল্লেন 'ঐ আমি কে জান্লেই সব জানা হ'য়ে যাবে। করণীয় বল্তে আছে এই একটিই। ঠিক ভাবে তাকাও নিজের মধ্যে—সর্ব সমস্যার পাবে সমাধান।'

পল্ ব্রাণ্টন্ বল্লেন—"সত্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টা আমি কম করিনি—কিন্তু কিছু লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। ঠিক ভাবে চল্বো কোন্ পন্থায়, বলে দিন্।"

মহর্ষি বল্লেন—"আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ সহজে চোখে পড়ে না। লাভ যে হয়নি তুমি জান্লে কেমন ক'রে। আত্মস্বরূপের প্রশ্নটি মনের মধ্যে রাখো জাগিয়ে। আলোক আসবেই।"

পল্ ব্রাণ্টন্ জিজ্ঞাসা করলেন—"গুরু কতখানি সাহায্য করতে পারেন এই চলার পথে?" উত্তর এলো—"অনুসন্ধানের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা তিনি দিতে পারেন।" আবার

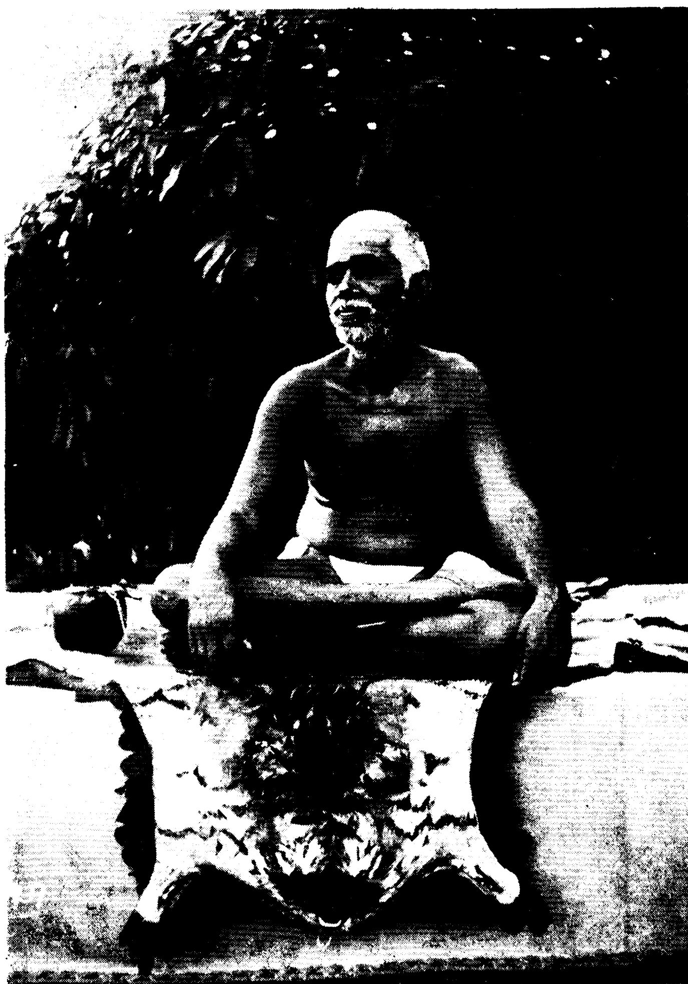
প্রশ্ন হ'ল—"কতদিন লাগে এই আলোক পেতে?" মহর্ষি উত্তর দিলেন—"সেটা নির্ভর ক'রে অনুসন্ধানকারীর প্রস্তুতির উপর। বারুদ জ্বলে এক নিমেষে, কিন্তু কয়লা জ্বলতে সময় লাগে।"

পল্ ব্রাণ্টনের মনে বহু প্রশ্নই ছিলো জমা হ'য়ে। এ সুযোগ তিনি ছাড়তে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—"দারুণ দুঃসময়ের সন্ধিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বর্তমান সভ্য জগৎ। জগতের ভবিষৎ কি—তারই ইংগিত চাই।" মহর্ষি বললেন—"ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি তোমার? বর্তমানেরই বা কতটুকু জানো! ভবিষ্যতের ভার ছেড়ে দাও ভবিষ্যতের হাতে। বর্তমানই ত যথেষ্ট।" পল্ ব্রাণ্টন্ এতেই ক্ষান্ত হ'বার পাত্র নন্। সভ্য-যুগের জীবন-সংগ্রামের স্বরূপটি অরণ্য-আশ্রমের অধিবাসীরা ভালো ক'রে জানেন না বলেই, তাঁরা না হয় নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন। কিন্তু পল্ ব্রাণ্টন্, যিনি এই হিংস্র বর্বরতাকে, সভ্যতার সঙ্কটময় রণক্ষেত্রকে স্বচক্ষে দেখেছেন—বর্তমানকে নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন কি করে! আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার কি মনে হয় পৃথিবীতে এবার শুভ ও মৈত্রীভাবের হবে বিস্তার, না উত্তরোত্তর যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলাই চলবে বেড়ে?" প্রশ্নটি মহর্ষির প্রীতিকর হ'ল না। তিনি বললেন—"একজন আছেন যিনি বিশ্বের নিয়ন্তা। তিনিই আছেন তাঁর সৃষ্টির ভার বহন করবার

জন্য। প্রাণের যিনি স্রষ্টা—প্রাণকে রক্ষা করতেও তিনি জানেন। বিশ্বের দায়িত্ব তাঁর—তোমার নয়।”

পাশ্চাত্য চিন্তার দায়িত্ব জ্ঞান তখনো পল্ ব্রান্টন্‌কে ছাড়ে নি। মহর্ষির উক্তিতে তাঁর চিরাচরিত দৃষ্টিভংগীটিই আর একবার স্বমত-প্রতিষ্ঠায় মুখর হ’য়ে উঠ্‌লো। তিনি মন্তব্য করলেন—“কিন্তু কোথায়? খোলা চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে নির্ভর সান্ত্বনার যুক্তি মেলে কই?” নিরস কণ্ঠে মহর্ষি এই মন্তব্যের উত্তরে বল্‌লেন—“যেমন তুমি, তেমনি তোমার জগৎ। নিজেকেই যে বুঝ্‌তে পার্‌লো না—সে আবার যায় জগৎকে বুঝে নিতে। সত্যসন্ধানী যে তার কেন এ প্রশ্ন! লোকে অযথা শক্তিক্ষয় ক’রে এই সব জিজ্ঞাসায়। প্রথমে আবিষ্কার করো সত্যের পটভূমিকা নিজের মধ্যে, তার পরে জগতের পটভূমিকায় সত্যের খোঁজ করো। কারণ তুমি জগতেরই একটি অংশ ছাড়া আর কিছু নও।”

প্রথম দিনের পরিচয়ের সুরু এবং শেষ হ’ল এইখানেই। এর পরে যে কয়দিন পল্ ব্রান্টন্ রমণাশ্রমে রইলেন, দিনে দিনে রূপান্তরিত হ’তে লাগলো তাঁর মহর্ষি সম্বন্ধীয় মনোভাব। মনে হ’তে লাগলো-যেন এই মানুষটি জনতাকে অতিক্রম ক’রে এক দুর্নিরীক্ষ লোকে নিজত্বের মধ্যে করেছেন স্থিতিলাভ। সাধারণ মানুষের দুঃখসুখের সংগে তাঁর কোথাও কোন যোগ



আত্মসমাহিত মহর্ষি



রমণাশ্রমের গোশালা



জ্যোতির্লিঙ্গম্ শিবমন্দির, তিরুভান্নামালাই

বা মিল নেই। নির্জন গিরিশিখরের সংগে, সম বিশ্ব প্রকৃতির সংগে, বন প্রান্তর অরণ্যের সংগে যেন তাঁর ঘনিষ্টতর আত্মীয়তা। অনন্ত শূন্য আকাশের সংগে তাঁর যোগাযোগ। সমস্ত বন্ধনের উর্ধে, যাবতীয় ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতাময় জাগতিক সম্বন্ধের পরপারে এমন একটি দুরারোহ স্থিতি তিনি লাভ ক'রেছেন যে সবাইকার মাঝে থেকেও তিনি হ'য়ে উঠেছেন দুর্লভ—চিরদিনের একা।

দৈনন্দিন পরিচয়ের ফলে পল্ ব্রাণ্টনের মনে মহর্ষির প্রথম দিনের আত্মতত্ব সহজ বোধ্য হ'য়ে উঠেছিল এ কথা আমরা অনুমান ক'রে নিতে পারি। কিন্তু অজ্ঞতার দ্বিধা ত সহজে যায় না! যোগীরা যে যোগের কথা বলেন—সে কি সংসারের মধ্যে থেকে সম্ভব? তাই যদি হ'বে তবে তাঁরা বনে জংগলে পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে তপস্যার আয়োজন করবেন কেন? অথচ মহর্ষি এ ধরণের তপস্যার কথা বলেন না। বলেন আত্ম-জিজ্ঞাসার কথা, আত্ম-বিশ্লেষণের কথা। সংসারে বাস করে—বিশেষত পাশ্চাত্য জীবন যাত্রার গতিমুখর কর্মস্রোতে এই ধরণের আত্ম-জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা কোথায়? অথচ মহর্ষির দৃষ্টিতে এই আত্ম-জিজ্ঞাসার ধারাটি কর্ম জীবনকে বাদ দিয়ে নয়। আত্মধ্যান যদি ঠিকমত হয়—তার ফলে কর্মের নিগূঢ় কৌশলটিই শেষ পর্যন্ত আয়ত্বে আসে। একটি সুরই বেজে ওঠে দুটি বিভিন্ন ধারায়।

পল্ ব্রাণ্টন কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করেন—"তাই যদি হয়, তা'হলে কর্মের রূপটি শেষ পর্যন্ত কেমন হ'য়ে ওঠে ?"

মহর্ষি উত্তর দেন—"এই ভাবে চল্‌তে চল্‌তে মানুষের প্রতি ও বস্তু জগতের প্রতি তোমার দৃষ্টিভংগিটিই যাবে ধীরে ধীরে বদ্‌লে। কর্মগুলি ধ্যানধর্মী হ'য়ে উঠ্‌বে।"

পূর্ব প্রসংগের জের টেনে পল্ ব্রাণ্টন বলেন—"কিন্তু যোগীরা ত' তা বলেন না। কর্মকে বাদ দিয়ে ত্যাগের পথে তাঁদের তপস্যার জয়যাত্রা।"

মহর্ষি বলেন—"ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্বন্ধে বাঁধা সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে, মিথ্যা সত্বার মোহকে দিতে হয় বিসর্জন। একেই বলে সত্যিকারের সন্ন্যাস।" চম্‌কে ওঠেন পল্ ব্রাণ্টন। তবে কি সত্যই সাংসারিক কর্মে লিপ্ত থেকেও নিঃস্বার্থ হওয়া যায়। দ্বিধা পীড়িত কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করেন—"যদি কর্মের মধ্যেও সন্ন্যাসের স্থান থাকে তবে যোগীরাই বা কেন সে পথটি গ্রহণ করেন না ?"

উত্তর পেলেন—"যোগীদের পদ্ধতি বিভিন্ন। মনটাকে তাড়না ক'রে তাঁরা কেন্দ্রের অভিমুখে পরিচালিত করেন। আর এ পথে মন স্বচ্ছন্দ-সুখে আকর্ষিত হ'য়ে নিজের স্থানটি বেছে নেয়।"

পল ব্রাণ্টন বললেন—"কোন্ আকর্ষণের কথা বলছেন—ঠিক বুঝ্‌তে পারলামনা।"

মহর্ষি বল্‌লেন: "ঐ যে নিজেকে নিজে প্রশ্নকরার কথা বল্‌লাম—'কে আমি'। এই অনুসন্ধানে লেগে থাকলে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হবে মনাতীত পটভূমিকা। এ দিকটা যতোই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌বে ততই অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার ঘটবে সমাধান। আচ্ছা আরো একটু পরিষ্কার করে বলছি। সব মানুষই কামনা করে এমনতর সুখ বা আনন্দ যাতে দুঃখের সংস্পর্শ লাগে নি। যে আনন্দ ফুরিয়ে যাবে না তাই সবাই চায়। সহজাত এই প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সংগে সংগে আর একটি চিরন্তন সত্যকেও না মেনে উপায় নেই যে, নিজেকে মানুষ যত ভালোবাসে তত আর কোন কিছুকেই ভালবাসে না। এবার এই দুটিকে একসংগে মিলিয়ে দিলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে প্রত্যেকটি মানুষই আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে কোন না কোন পন্থা অনুসরণ ক'রে চলেছে। কেউ নিচ্ছে ধর্ম্মের আশ্রয়, কেউ বা খাচ্ছে মদ। কিন্তু পন্থা যা'ই হোক উদ্দেশ্য সেই আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর থেকে এই প্রমাণই হয় যে—আনন্দ হ'ল মানুষের সত্যিকারের স্বভাব। মানুষের প্রকৃত স্বত্বার স্বরূপটিই হ'ল আনন্দ। আনন্দের অনুসন্ধানের সংগে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে আত্মানুসন্ধান; কারণ, আনন্দ চাওয়ার মানেই হ'ল আত্মবস্তুকে চাওয়া। আত্মবস্তু অমর। একে লাভ কর্‌লে তবেই মানুষ সেই আনন্দকে লাভ করে যার শেষ নেই।"

পল্ ব্রাণ্টন্ বিহ্বল হ'য়ে শুনলেন। হয়তো বা কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থটি ঠিক ধরতে পারলেন না। অথবা হয়তো —দুঃখ প্রপীড়িত, আর্ত্ত, ব্যথিত মানবতার যে স্বরূপটি তাঁর প্রত্যক্ষ বস্তু তার সংগে মহর্ষি বর্ণিত এই আনন্দময় অবিনশ্বর সত্বার যোগটি খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্লো না। তাই বল্লেন—"পৃথিবীতে ত' দেখি দুঃখের অন্ত নেই।" মহর্ষি বল্লেন—"হ্যাঁ, তার কারণ জগতের লোকে আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ। অথচ একথাও ঠিক যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সুখ সন্ধানের বেনামীতে আত্মানুসন্ধান কর্ছে না এমন মানুষই নেই। যে পাপী সেও পাপ করে আনন্দের জন্য—আনন্দ-স্বরূপ সত্বার অনুসন্ধান-প্রেরণাই পাপকর্মের রূপে প্রতিভাত হয়। স্বতস্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তির মূলটি প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে বলে তারা জানেও না যে দোষ-দুষ্ট পথে আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তিই তাদের পরিচালিত কর্ছে।"

পল্ ব্রাণ্টন জিজ্ঞাসা কর্লেন—"যে আত্মবস্তুকে জান্লে পরিপূর্ণ আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়—কাকে বলে সেই আত্মবস্তু? যে 'আত্মকে' আমি জানি—তা ছাড়া আরও যে আত্মবস্তুর কথা আপনি বল্ছেন, তাকে মান্তে হ'লে ত' একাধিক আত্মবস্তুর অস্তিত্বকে মান্তে হয়।" স্মিত হাস্যে মহর্ষি বল্লেন—"না, তা নয়। একাধিক সত্বা কারুর থাকে না। সত্বা একটিই; কিন্তু এই সত্বাটিকে নিঃসংশয়ে

চিনে নিতে হ'লে যে আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন সাধারণত তারই ঘটে অভাব। আত্ম বলতে, বহুদিনের পুঞ্জীভূত সংস্কারে আমরা বুঝে রেখেছি দেহকে আর মস্তিষ্ককে। সত্যিকারের আত্মবস্তুর সংগে মুখোমুখি পরিচয় ঘট'বার সুযোগ হ'ল কৈ? কে আমি—এই অনুসন্ধানের সেই জন্যই ত' প্রয়োজন। প্রকৃত যে আত্মবস্তু তার বর্ণনা করা ত' সহজ নয়! এইটুকুই কেবল বলা যায় যে ব্যক্তিগত আমির বোধটি যে সত্বা থেকে উদ্বুদ্ধ হয় এবং যেখানে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে যায়, তাই হ'ল আত্মসত্বা।"

গোল বাধ্‌লো মহর্ষির এই শেষের কথাটিতে। 'আমি' বোধটি সত্বাথেকে উদ্বুদ্ধ হ'ল। ফলে এলো আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব। এ পর্যন্ত পল্‌ ব্রাণ্টন এক রকম করে মেনে নিলেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বটি যদি আবার এই সত্বায় গিয়ে মিলিয়ে যায় তবে আর আত্মসত্বা বল্‌তে থাকে কি? যে সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণের পন্থার কথা মহর্ষি বল্‌ছেন সেই পথে আমির ধারাটিকে অনুসরণ করে যদি বা শেষ পর্যন্ত তার উৎসমুখে গিয়ে পৌঁছানো যায়, তখনো থাকে সমস্যা কণ্টকিত আরও একটা সম্ভাবনার প্রশ্ন। 'আমি' বোধটি যখন সত্যি সত্যিই মিলিয়ে যাবে—তখন অবশিষ্ট থাকবে কি? হয় মানুষটা হবে জড়বুদ্ধি, না হয় জ্ঞান শূন্য। আশংকার কথাটি পল্‌ ব্রাণ্টন্‌ অকপটে মহর্ষিকে জানালেন।

স্বভাবসিদ্ধ কোমল স্মিত হাস্যে মহর্ষি বল্লেন—"না, সে ভয় নেই। আত্মসত্বায় প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ স্ব-স্বরূপে বা চৈতন্যসত্বায় হয় প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞানের স্থান নেই এই জ্ঞানময় অমৃতসত্বায়।"

কিন্তু পল ব্রান্টনের মনে তখনো ছিল, সেই মিলিয়ে যাওয়া 'আমি'টির দুশ্চিন্তা। তিনি প্রশ্ন করলেন—"যতো যাই হোক, উন্নততর সত্বার কেন্দ্রস্থলেও ত 'আমি' থাক্‌তে বাধ্য!" মহর্ষি উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ কিন্তু তখনকার 'আমি' তার সমগ্র সত্বা বোধক 'আমি' নয়। দেহ মনকে মাত্র নির্দেশ করে সেই আমি। আত্মসত্বার প্রথম সাক্ষাৎকারের সংগে সংগে সত্বার গভীর লোক হ'তে মনাতীত একটি বস্তু নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এই বস্তুটিকে কেউ বা বলে আত্ম, কেউ বা বলে স্বর্গরাজ্য, কেউ বা বলে নির্বান, কেউ বা বলে মোক্ষ। নাম যাই দাও—অসীম, অনন্ত স্বর্গীয় এই অবস্থাটি যার জীবনে ঘটে সেই হ'য়ে ওঠে পরিপূর্ণ; হারাবার কিছু থাকে না তার, অভাবও থাকে না তার কোনখানে।" "দ্বিধা, অনিশ্চয়তার শেষ কিছুতেই হয় না যে পর্যন্ত না জীবনের এই পরম অবস্থাটি আসে।

রাজশক্তি রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগে প্রজা শাসনের প্রহসনটা হয়তো বা খানিকদূর পর্যন্ত চালানো যায়; কিন্তু এই শক্তিমানেরা নিজেদের মনে অভ্রান্ত ভাবে জানে যে নিজেদের পরিচালনা করবার মত শক্তি তাদের নেই। বুদ্ধির গর্বে যারা তালঠুকে বেড়ায়,

হয়তো বা তারা জানে অনেক, লাভ করেছেও অনেক—কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো দেখি তারা জীবনের রহস্য ভেদ করেছে কি না। তখনি মনে হবে, শেষ পর্যন্ত যে তিমিরে সেই তিমিরেই তারা রয়ে গেছে। অনেক জেনেই বা কি হবে, সব কিছু জেনেই বা কি হবে, যদি নিজের রহস্যটুকুর মীমাংসাই জীবনে না হয়! শেষ প্রশ্নটি সবাই চলে এড়িয়ে, অথচ এ কথাও সত্য যে এর চেয়ে বড় জানা সংসারে আর কিছুই নেই।"

পল্ ব্রাণ্টন আবার বল্লেন—"মানি; কিন্তু মহর্ষি, ব্যাপারটি ত বড় সহজ নয়। মনে হয় যেন অতিমানুষিক।"

মহর্ষি বললেন—"তা হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। পথ যত কঠিনই হোক আয়াসসাধ্য, সন্দেহ নেই। ধ্যানের স্রোতটি অভ্যাসের দ্বারা জাগিয়ে রাখতে হয়। সাংসারিক কর্মধারার মাঝখান দিয়েও প্রবাহিত থাকে অব্যাহত ভাবে এই ধ্যানের ধারাটি। 'কে আমি'—এই জিজ্ঞাসাটি কর্মজগতের মাঝখানে প্রতিফলিত হয়ে এই ভাবটিই রাখে জাগিয়ে যে দেহ বা মস্তিষ্ক বা আকাংখাগুলির কোনটাই আত্মবস্তু নয়। জিজ্ঞাসার ভাবটি ঠিকমত জাগিয়ে রাখতে পারলেই ধীরে ধীরে আত্ম-সত্বার গভীর লোক হতে নিঃশব্দ অনুভূতির প্রবাহে সমাধানটি এসে হাজির হয়। মনের দ্বিধাগুলি, সমস্যাগুলি একে একে যায় মিলিয়ে। সূর্যালোকের মত স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে সত্যবস্তু।"

মহর্ষির কথাগুলি দোলা দেয় পল ব্রাণ্টনের সংশয়াচ্ছন্ন চেতনায়। মহর্ষির অত্যুজ্জ্বল প্রজ্ঞানঘন দৃষ্টির সামনে যে সত্যকে করতলগত বলে মনে হয়, তাঁর দৃষ্টির আড়ালে তা'ই যেন মনে হয় অসম্ভব কল্পনার মতই সুদূর। নিভৃত ভারতের অনুসন্ধানে এসে—অনেক যাদু অনেক ইন্দ্রজালের ভীড় ঠেলে বারে বারে এসেছেন মহর্ষির সান্নিধ্যে—বারে বারে গেছেন ফিরে পল্ ব্রাণ্টন। সাংবাদিকতার ভূয়োদর্শন-স্পৃহা টেনেছে তাঁকে একদিকে; আর একদিকে টেনেছে কেন্দ্রাতিগ শক্তির দুর্বার আকর্ষণ। ভূত-গ্রস্তের মত পল্ ব্রাণ্টন দিকে দিকে পরিভ্রমণ করে খুঁজে বেড়িয়েছেন কখনো বা সাপের ওঝা, কখনো বা অলৌকিক শক্তিশালী সাধু সন্ন্যাসী ফকির। কৌতুহলী হয়ে জানতে চেয়েছেন এই সমস্ত তথাকথিত দৈব-শক্তির মূলগত রহস্যটি। সংগ্রহ করেছেন সাংবাদিকতার উপকরণ। আবার পরক্ষণেই এই সমস্ত অনুসন্ধান অকস্মাৎ হ'য়ে উঠেছে অর্থহীন। আত্মসত্বার আহ্বানে আবার ছুটে গেছেন অরুণাচল পর্বতের সানুদেশে। তাঁর মনে হয়েছে যেন তিনি মহর্ষির সান্নিধ্যে এসে ফিরে পেয়েছেন তাঁর বহুদিনের হারানো শৈশব। স্বপ্নের মত মনে হয়েছে যেন বিগত দিনের আশা আকাংখার সংগে আর তাঁর এ জীবনের কোন যোগ নেই, নেই কোন সামঞ্জস্য। মহর্ষির অভ্যুদয়ের সংগে সংগে যেন কেমন করে সব কিছুই গেছে ওলোটপালোট—একাকার

হ'য়ে। অথচ ঠিক যাকে বলে গ্রহণ করা, তাও যেমন এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যাকে বলে অস্বীকার করা—তাও এ ক্ষেত্রে অসম্ভব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পল্ ব্রাণ্টনের জীবনে এই দোটানার ঘট্‌লো অবসান। কেমন কি ঘট্‌লো তার সঠিক পরিচয় পল্ ব্রাণ্টনের নিজের কথাতেই দেওয়া ভাল।

"ইতিমধ্যে আমার মনের মধ্যে জিজ্ঞাসার স্রোতটি এসেছে ক্ষীণ হ'য়ে। আমার চেতনায় যত রকমের অনুভূতির ছায়া পড়েছে, বিধিমত ভাবে দেখেছি তাদের পরীক্ষা ক'রে। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের কোনরকম সুবিধাই এতে হয় নি। চেতনার কেন্দ্রস্থলে ডুব দিয়ে চিন্তার উৎস সন্ধানে হয়েছি সচেষ্ট। হঠাৎ যেন কোন্ এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে মন গেল নিজের মধ্যে বিলুপ্ত হ'য়ে—রইলো একটা অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা। ছায়ার মত হয়ে মিলিয়ে গেল পরিচিত জগত। তার পরে এলো একটা অপরিসীম শূন্যতা।"

"সাধারণত এই শূন্যতার ভাবটিকে জাগিয়ে রাখতে মনের সংগে খানিকটা বোঝাপড়ার দরকার হয়। কিন্তু আজ আর আমার তরফে কোনরকম সচেষ্টতার প্রয়োজন হ'ল না। কি যেন একটা দুর্বার শক্তির আকর্ষণে আমার সমগ্র সত্ত্বা হ'য়ে উঠ্‌লো অন্তর্মুখী। সংগে সংগে মনে হ'ল যেন আমার আর নিজের চেষ্টা বলতে কোন কিছুই নেই—এবং তার প্রয়োজনও

গেছে ফুরিয়ে। বুদ্ধির সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ কর্‌লাম একটির পরে একটি চিন্তার ধারাবাহিক আবির্ভাব। মনে হ'ল এদের সংগে আমার কোন যোগ নেই। এরা আসে যায় এদের নিজের নিয়মে, বোঝা হ'য়ে চেপে বসে থাকে মনের উপরে। মনে হ'ল যেন এই প্রথম এদের স্বেচ্ছাচারের পীড়ন হ'তে পেয়েছি নিষ্কৃতি। চিন্তার পাশ কাটিয়ে ইচ্ছা হ'ল এবার গভীরে দিই ডুব। চেতনার গভীর লোকে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আবিষ্কার করি চিন্তার প্রাথমিক উৎসটিকে।"

"সঙ্কল্পটি জাগলো আর সংগে সংগে কি যেন একটা ঘটে গেল। চিন্তার জ্বলন্ত বাতিটা দপ ক'রে গেল নিভে। চেতনা আছে, অথচ মস্তিষ্কের ক্রিয়া নেই। চৈতন্যের কেন্দ্রস্থলে লগ্ন 'হয়ে গিয়ে চিন্তা গেছে স্তব্ধ হ'য়ে। এ যেন একটা গভীর সুষুপ্তির ভাব। অথচ এ জড় সুষুপ্তি নয়, কারণ এর মধ্যেও চৈতন্য আছে অব্যাহত। শান্ত হয়ে সব কিছুই আমি প্রত্যক্ষ কর্‌ছি, জান্‌ছি আমি কে, বুঝ্‌ছি কি ঘট্‌ছে কিন্তু এই জানার মধ্যে নেই সত্বার স্বাতন্ত্র্য। এ যেন এক নূতনতর 'আমির' দীপ্যমান সত্বায় আমার রূপান্তরিত পরিণতি। এ যেন এক বিশাল, বিরাট ভূমায় অনির্বচনীয় মুক্তিস্নান—অমাকে ঘিরে আছে শূন্যময় নভতল, অনন্তকালের বাঁধন গেছে খুলে।"

"আমার মনে হ'ল আমি যেন বিশ্বচেতনার বহির্দেশে পেয়েছি আশ্রয়। পৃথিবী নামে যে গ্রহটির বাসিন্দা আমি সে যেন কোথায় গেছে মিলিয়ে। সৃষ্টির আদিমতম জ্যোতিঃসমুদ্রে যেন আমি করেছি অবগাহন। আমি যেন বিশ্ব নাট্যের অন্তর্নিহিত রহস্য-কেন্দ্রকে পরিক্রমা করে এক মুহূর্তে নিজের প্রাচীনতম সত্বায় এলাম ফিরে। এখানে যেন শান্তির অমৃত-সাগর। বিগতকালও নেই, আগামী কালও নেই। সমস্ত সৃষ্টিতে ওতপ্রোত হ'য়ে যেন আমি আমার সীমানার বাইরে গেছি বহু বিস্তৃত হ'য়ে—খুঁজে পেয়েছি আমার সত্বার অর্থ।"

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বল্‌তে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে পল্ ব্রাণ্টনের কোনরূপ ধারণাই যে ইতিপূর্বে ছিল না—তাতে ভুল নেই। অথচ নিঃসংশয় সত্যের রূপে যখনি তাঁর চেতনার দ্বারে পরমতম রহস্যটি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো, তখনি যেন এক নিমেষে ঘটে গেল কি একটা বিপর্যয়। ধ্যানের ঘোর যখন কাট্‌লো—ধীরে ধীরে পল্ ব্রাণ্টন ফিরে এলেন পূর্বতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। মহর্ষির বস্‌বার ঘরটি তখন প্রায় জনশূন্য। ঘড়ির দিকে চেয়ে তিনি বুঝলেন যে এক ঘর লোকের মধ্যে একভাবে বসে ইতিমধ্যে দুটি ঘণ্টা কেটে গেছে। আহারের ঘণ্টা হতেই সবাই নিঃশব্দে কোন সময় একে একে উঠে গেছেন। পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক

বৃদ্ধ আরও কাছে ঘেঁসে এসে আনন্দ সংবাদটি দিলেন জানিয়ে—"যতক্ষণ আপনি ধ্যানস্থ ছিলেন, মহর্ষির দৃষ্টি সারাক্ষণ নিবদ্ধ হ'য়েছিল—আপনার দিকে। সে দৃষ্টির প্রভাব নিশ্চয়ই আপনি বোধ করেছেন।"

এই ঘটনার পরে দু' এক দিনের মধ্যেই পল্ ব্রাণ্টনের ভারতবর্ষে অবস্থানের মেয়াদ শেষ হ'ল। কর্মজগতের আহ্বানে দিতে হ'ল তাঁকে সাড়া। পিছনে পড়ে রইলো রমণাশ্রমের তপোভূমি। কিন্তু তাঁর নিজের কথা থেকে জানা যায় যে আসন্ন বিদায়ের ক্ষণটিতেও সবচেয়ে বড়ো হ'য়ে ছিল এই ধ্রুব বিশ্বাসটিই যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হ'য়ে সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতের অমোঘ বিধানে আবার তাঁকে ফিরে আস্তে হবে। পল্ ব্রাণ্টনের ঘটনাবহুল বিচিত্র অভিজ্ঞতার এই অধ্যায়ে ছত্রে ছত্রে যে কথাটি ফুটে উঠেছে তার সারার্থ হল এই যে, মহর্ষির মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর নিজের অজ্ঞাত সত্বাকে। সংগে সংগে তাঁর জীবনের নিভৃত গভীর লোকে বেজে উঠেছে নূতনতর একটি সুর যার আবেদনকে অগ্রাহ্য কর্বার মত শক্তি তাঁর নেই।

মহর্ষি রমণের অলোক-সামান্য জীবন কাহিনীর পটভূমিকায় নানান কারণে পল্ ব্রাণ্টনকে অনেকখানি স্থান দেওয়া হয়েছে। মহর্ষির পরিচয়ের যে বিশেষ দিকটি এই বিদেশী মানুষটিকে উপলক্ষ ক'রে হ'য়ে উঠেছে উদ্ভাসিত, তাকে বাদ দিলে

মহর্ষি চরিত্রের অনেকখানি মাধুর্যই যেন বাদ পড়ে যায়। পল্ ব্রাণ্টনের সাংবাদিক মনোবৃত্তি তাঁর লিখিত বিবরণে হয়তো বা নানাভাবেই প্রতিফলিত হয়ে আছে। হয়তো বা তাঁর উচ্ছ্বাসময় বর্ণনায় সাংবাদিক সুলভ মামুলী অত্যুক্তির অভাব নেই। এমনও হতে পারে যে নূতনত্বের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি অনেক কিছু বলেছেন যা সর্বতোভাবে তাঁর অন্তরের কথা নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতার সমক্ষে কোন একটা চমকপ্রদ নূতন তথ্যকেই তিনি সাহিত্যের সজ্জায় সাজিয়ে হৃদয়গ্রাহী করে বল্‌তে চেয়েছেন—এইটুকু মাত্র স্বীকার করলে পল্ ব্রাণ্টনের উপরে নিদারুণ অবিচার করা হবে। উচ্ছ্বাস, মোহ, সাংবাদিকতার বদভ্যাস ইত্যাদি বাদ দিলেও তাঁর আত্মকাহিনীর মধ্যে এমন অনেক কিছু থাকে যা চিরন্তন সত্যের কোঠায় স্থান পাবার যোগ্য।

মহর্ষি রমণের সত্যিকারের স্বরূপটি পল্ ব্রাণ্টনের কাছে কতখানি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু তৎসত্বেও এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, যে দৃষ্টি দিয়ে তিনি মহর্ষির কার্যকলাপকে লক্ষ্য করেছেন, তার সবটাই নিছক সাংবাদিকতা নয়। মহর্ষির কাছে এসে মানবাত্মার নবতর মাহাত্ম্যের একটি রূপ তিনি চোখ দিয়ে দেখেছেন, মন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তা না হ'লে মহর্ষিকে এভাবে গ্রহণ করা তাঁর

পক্ষে সম্ভব হ'ত না। পাশ্চাত্য দৃষ্টির বিচার-বুদ্ধির মাপকাঠি যে এখানে অচল—এ কথাটা তাঁকে কেউ বলে দেয় নি। তাঁর আজীবন সংস্কারের মজ্জাগত এই মাপকাঠিটা তিনি অত্যন্ত সহজে মহর্ষির ক্ষেত্রে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়েছেন, এটা কম কথা নয়।

পল ব্রাণ্টন দিনের পর দিন মহর্ষির আশ্রমে অবস্থান করে দেখেছেন—শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধি নিয়ে, নানা দেশের নানা ধর্মের বিবিধ নরনারী তাঁর কাছে আশ্রয় নিতে আসে। যার অনেক আছে সেও আসে, যার কিছু নেই সেও আসে। ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, ভক্ত অভক্ত, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী—কারুর সঙ্গে মহর্ষি বড় একটা বাক্যালাপ করেন না। বিশেষ ভাবে কারুর দিকে তিনি চেয়ে দেখেছেন বলেও মনে হয় না। কারুর জন্য কোনরকম দুশ্চিন্তা করেছেন বলেও মনে হয় না। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে কেবল এই ক্ষণকালের সান্নিধ্যটুকু লাভ করেই যেন কোন অলৌকিক প্রভাবে রোগীর রোগ সেরে গেছে, বিষণ্ণের মুখে ফুটেছে হাসি, চিন্তিতের চিন্তা গেছে দূর হ'য়ে। পল্ ব্রাণ্টনের মনে হয়তো প্রথম প্রথম সন্দেহ জাগতো। তিনি হয়তো ভাবতেন, এ তাঁর মনের ভুল—দৃষ্টির ভ্রম। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তাঁর মন উদ্যত হ'য়ে উঠ্‌তো। তিনি ভাবতেন—এ কেমন ক'রে সম্ভব হয়?

কিন্তু চোখের সাম্‌নে যে ঘটনা নিত্য ঘটছে তাকে অস্বীকার করা যায় কি ক'রে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁর নিজের দ্বিধাগ্রস্ত পীড়িত মনেও বুঝি মহর্ষির অত্যাশ্চর্য প্রভাবটি তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই হ'য়ে গেল প্রতিফলিত। বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও তিনি অন্তরে অন্তরে, অনুভূতির স্তরে স্তরে, চেতনার অদৃশ্য লোকে, লাভ কর্‌লেন মহাসত্যের প্রেরণা। বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করে যে নিগূঢ় নিঃশব্দ সত্বা—না বুঝেও তাকে তিনি মেনে নিলেন। অথবা বোধাতীত পরম রহস্য এমন ক'রেই তাঁর অন্তরকে পেয়ে বস্‌লো যে বুদ্ধি বা যুক্তির কোনরূপ জিজ্ঞাসাই আর সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌তে পারলো না। তিনি দেখলেন সত্যের স্বরূপ। স্থান কাল শিক্ষা সংস্কারের সমস্ত বিভেদকে অতিক্রম ক'রে অতি অনায়াসে তিনি সন্দেহাতীত সত্যকে নিলেন চিনে।

মহর্ষির সন্নিধানে এসে যে সমস্ত অগণিত নরনারী দিনের পর দিন সাক্ষাৎ সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি আহরণ ক'রে নিয়ে গেছেন তাঁদের কয়জনের সংবাদই বা আমরা জানি! এঁদের মধ্যে যে দু'একজন ছাপার অক্ষরে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, শ্রীমতী শ্যাস্‌কালিন্‌ ম্যালেট্‌ তাঁদের অন্যতমা। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজী ভাষায় লিখিত মহর্ষির প্রথম জীবনীর অভ্যুদয় হয়, তখন

থেকেই দেশ-দেশান্তরের চিঠিপত্র আসা সুরু হ'ল। দেখা গেল, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বুকে জেগে আছে শাশ্বত তৃষ্ণা। যারা পথহারা তারা পথের সন্ধান চায়, যারা প্রবঞ্চিত তারা উঠ্‌তে চায় বঞ্চনার ঊর্ধে। শ্রীমতী ম্যালেট্‌ কিসের আশায় আকুল হ'য়ে ছুটে এসেছিলেন তা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর নিজের লেখা কথাগুলি পড়লে বোঝা যায় যে নিছক তৃষ্ণার দিক দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন পার্থক্য নেই। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা তিনি করেছেন তা এইরূপ :—

"বড় রাস্তার মোড় ঘুরে সামনেই পড়লো বিরাট এক আম গাছ। তারই পাশ দিয়ে আশ্রমের প্রবেশ দ্বার। একটু এগিয়ে যেতেই বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী গৃহগুলি চোখে পড়লো। আমাদের আসবার কথা ছিল না। কিন্তু দেখলাম, যে আসে তাকেই এখানে সাদরে গ্রহণ করা হয়। দু'একটি কথার পরেই আমরা মহর্ষির সান্নিধ্যে নীত হ'লাম। ঘরের ছাদ থেকে দুটি আলো ঝুল্‌ছে। টালি বিছানো মেজেয় একঘর ভারতবর্ষীয় মানুষ সারি সারি আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসে আছে। ঘরের এক ধারে, দরজার সোজাসুজি চৌকিতে উপবিষ্ট একটি মূর্ত্তি—নিঃশব্দ নিস্পন্দ। গভীর ধ্যানে তিনি ডুবে আছেন। মনে হয় না যে কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তু সম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র সচেতন।"

"নিঃশব্দে প্রবেশ ক'রে ভারতীয় প্রথায় প্রণাম জানিয়ে আমরা ভীড়ের মধ্যে স্থান ক'রে নিয়ে একধারে বস্‌লাম। সমগ্র পারিপার্শ্বিকের সংগে মাঝখানের মানুষটির প্রভাব অতি অবিস্মরণীয় ভাবে মনের মধ্যে ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। মনে হ'তে লাগলো যেন শান্ত মহিমায়, সমাহিত শক্তিতে ও প্রশান্ত স্থৈর্যে এই মহামানবের ব্যক্তিত্ব সমস্ত স্থানটিতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। বলে বোঝানো যায় না এমন একটি নিবিড় শান্তির আবেষ্টন আছে ছড়িয়ে। নক্ষত্রের মত উজ্জল দু'টি চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন জীবনে এই প্রথমবার অসীমের আভাস পেলাম; রসঘন আনন্দলোকের আবর্তে পড়ে ভেসে গেলাম। চকিত বিস্ময়ে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগলো—কে এই পুরুষোত্তম? ক্রমবিবর্তনের মানবীয় বা অতিমানবীয় কোন্ স্তরে এঁর অবস্থিতি? অবশ্য এমনতর প্রশ্নের কোন অর্থই নেই। সূর্য যখন ওঠে তখন সেই সাক্ষাৎ মহাপ্রকাশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেন, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি জান্‌তে চাওয়ার প্রয়োজন হয় না। বক্ষে যার তৃষ্ণা সে কি সামনে সুপেয় জল পেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌বে—কোথাকার জল?"

"অস্থির, চঞ্চল, বুদ্ধি-সর্বস্ব আমার মন শান্ত হয়ে নিঃশব্দে অবগাহন করলো এই অত্যুজ্জল আলোকের ধারায়। মনে হল যেন আমার চারিদিকে দ্যুতিময় মহাশক্তির তরংগ উচ্ছসিত আবেগে

দ্যুলোকের পানে ছুটেছে মহর্ষির নির্বাত-নিষ্কম্প দেহে নেই এতটুকু চঞ্চলতা। সেই ঘরের মধ্যে যারা বেদ পাঠ করছিলো তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন ছিলেন না। আমি অনুভব করলাম তিনি যেন স্থানকালের সীমানা ছাড়িয়ে এই পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে বিরাজ করছেন।”

মনে রাখতে হবে যে এই উচ্ছ্বসিত উক্তি অন্তরংগ স্তবের মত যাঁর অন্তর থেকে নির্গত হয়েছে, তিনি ইতিপূর্ব্বে মহর্ষিকে জানা দূরে থাক, কখনো চোখেও দেখেন নি। শ্রীমতী প্যাস্কালিন্ ম্যালেটের জন্ম ও শিক্ষা ফরাশী দেশে। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশ। এখানকার সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংগে তাঁর কিছুমাত্র পরিচয় নেই। আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি ইত্যাদি ব্যাপার তাঁর কাছে নিতান্তই কথার কথা। এই সব আধ্যাত্মিক স্তরের কথা তিনি যদি বা কখনো কানে শুনে থাকেন, তাহলেও বিলাতী মানুষ যে ভাবে সচরাচর এ সব কথা শোনে, সেই ভাবেই বড় জোর শুনেছেন। এমন অবস্থায়, এই অদৃষ্ট-পূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে এই এক অজ্ঞাতকুলশীল অর্ধ-উলঙ্গ অসুন্দর প্রৌঢ়কে প্রথমবার দর্শন করেই, তাঁর অন্তর এমন ক'রে কানায় কানায় ভ'রে উঠ্লো কেন? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন—“কেন আমার মনে এমনতর ধ্রুব বিশ্বাসের জন্ম হ'ল তা আমি কোনদিন বুঝিয়ে বল্তে পারবো না।

এ আমার বুদ্ধির কথা নয়। যেমন ক'রে সৌরভকে অনুভব করি কিন্তু বোঝাতে পারি না, তেমনি ক'রে পেলাম আভাষ আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। বর্ণনা করতেও পারবো না, প্রমাণ দিতেও পারবো না আমার এই পরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতার। কিন্তু এ কথাও সত্য যে এ জীবনে কোনদিন এই অচিন্ত্যনীয় আবির্ভাবকে আমি ভুলতেও পারবো না। প্রথম দর্শনের পরের দিন যখন মহর্ষির সন্নিধানে উপস্থিত হ'লাম—দেখ্‌লাম তিনি চিঠিপত্র খবরের কাগজ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তখনো মনে হ'ল, সব কিছুর মাঝখানে থেকেও তিনি যেন কোন কিছুর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে নেই। যে আপেক্ষিক জ্ঞান অজ্ঞান নিয়ে আমাদের প্রতিদিনের কারবার—এ সবের ঊর্ধে তিনি যেন বিশ্বসৃষ্টির মূলকেন্দ্রে সংলগ্ন হ'য়ে আছেন। অথচ এই নিরালম্ব, নিরুপাখ্য, নির্গ্রন্থ অবস্থায় থেকেও তিনি জগতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই। তাঁর মধ্যে করুণা আছে, মমতা আছে, সহৃদয়তা আছে, সহানুভূতি আছে। দুঃখজর্জরিত শোক-নিপাড়িত মানুষগুলির দুঃখ তিনি কান পেতে শোনেন, বুক ভ'রে করেন অনুভব। যারা আসে তারা কেউই শূন্যপ্রাণে ফিরে যায় না।"

ঠিক এমনি ধরণের অনুভূতির সাক্ষ্য দেয় আরও একজন য়ুরোপীয় দার্শনিকের লিখিত বিবরণ। এঁর নাম গ্র্যাণ্ট্ ডাফ্। সারা জীবন ধরে দর্শন শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পর্যালোচনা

ক'রে এঁর মনে এই ধারণাটিই বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেছিল যে বিবিধ দর্শনের আলোচনায় সত্যকে জানা যায় না। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় দার্শনিকবৃন্দের বিভিন্ন মতবাদ তন্নতন্ন ক'রে ঘেঁটে গ্রাণ্ট ডাফ্ বুঝলেন যে এই সব মতবাদ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আর্য্য সভ্যতার কাছে বহুলাংশে ঋণী ; অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঋণ স্পষ্ট ভাষার স্বীকৃত হয় নি। সত্যানুসন্ধানের পিপাসা যখন গ্রন্থপাঠের দ্বারা মেটানো গেল না, তখন তিনি ভারতবর্ষে চলে এলেন এবং শেষ পর্যন্ত মহর্ষির সান্নিধ্যলাভ ক'রে কৃতার্থ হলেন। নিজের কথা তিনি যে ভাবে বলেছেন তা এইরূপ ঃ

"মহর্ষির কাছে এসে অচিরেই আমি বুঝ্লাম যে এই মানুষটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সীমানা অতিক্রম ক'রে আত্মসত্বার কেন্দ্রস্থলে নিঃসংশয়ভাবে হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত। দেহটি কোনরকমে টিকে আছে জগতের কল্যাণ কল্পে। দেহ ছাড়া আর যা কিছু, সব অনন্তের মাঝে মিশে একাকার হ'য়ে হারিয়ে গেছে।

লোকে জিজ্ঞাসা কর্তে পারে আমার এ প্রত্যয় হ'ল কি করে। আমি বল্বো, জানালার বাইরে তাকিয়ে যখন সূর্যকে দেখি, তখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা ক'রে কেমন করে আমি সূর্যকে দেখ্লাম—তার যা উত্তর, আমার উত্তরও তাই। আমি বল্বো চোখ মেলে চেয়েছিলাম, অন্য সব ইন্দ্রিয় করেছিল সহযোগিতা,—তাতেই দেখা সম্ভব হ'য়েছিল। প্রত্যক্ষ সূর্যকে দেখ্তে বীজগণিত বা অন্যকোন শাস্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন হয় নি। মহর্ষির

বেলাতেও ঠিক তাই। তিনি যে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর, তারও আর অন্য কোন প্রমাণের দরকার আমার হয় না।”

এ কথার পরে আর কিছুই বল্‌বার থাকে না। কিন্তু গ্র্যাণ্ট ডাফ্ এর পরেও পথভ্রান্ত মানবজাতিকে সম্বোধন ক'রে আরও কিছু বলেছেন। তিনি বলেছেন—“জীবনের মেয়াদ আছে আর যে কটা বছর, কেন মিছে দর্শনের পাঁক ঘেঁটে বৃথায় অপব্যয় কর্‌বে? সত্য রয়েছে সামনে পড়ে; চোখ ভ'রে তাকে দেখো, বুক ভ'রে তাকে গ্রহণ করো। অনন্ত দীর্ঘ দুরূহ মতবাদের গোলকধাঁধায় পড়ে মিছামিছি নিজেকে বিভ্রান্ত করো না। পাশ্চাত্য দর্শনের অপরিসর জলাভূমি থাক পিছনে পড়ে। ধর্মতত্ত্বের কঠিন বন্ধুর পার্বত্য পথের নিষ্ফল যাত্রায় আসুক বিরতি। এই ত রয়েছেন সত্যস্বরূপ তোমার একান্ত সম্মুখে।”

আর এক যায়গায় এই ভক্তটিই লিখেছেন: “পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় ইতিপূর্বে আর কখনো চরমতম সত্যস্বরূপ মানুষের কাছে এতখানি সুলভ হ'য়ে, এত নিকটে সরে আসেন নি। এর আগে যতবারই অনুরূপ সুযোগ এসেছে তার পাশাপাশি এসে জুটেছে আমার পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধক। আজ এখনই,—বিশেষ কোন পূণ্য বা অধিকারের জোর যার নেই, সেও সোজা চলে গিয়ে সত্যস্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ কর্‌তে পারে। অসুবিধার মধ্যে বড় জোর রেলের খরচটা আছে। বিপদ ত' নেই-ই—হাতে হাতে লাভ রয়েছে আত্মজ্ঞানের মহাসম্পদ।”

কথাগুলি শুন্‌লে যে কোন লোকের মনে হবে এর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত খানিকটা উচ্ছ্বাসের আতিশয্য মেশানো আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে পরমতম সত্যের চরমতম বিকাশ, কবে কোথায় কি ভাবে ঘটেছে তা কোন মানুষেরই জানা নেই। কিন্তু সূর্যকে যখন দেখি তখন যদি ভুলে যাই যে এই সূর্যের পিছনেও বৃহত্তর সূর্যের অস্তিত্ব আছে সেটা কি অপরাধ? ভক্ত যে চোখ দিয়ে দেখে সে ত' সাধারণ মানুষের সচরাচর দেখার চোখ নয়। উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে যদি কোন আতিশয্য চোখে পড়ে সে দোষ ভক্তের নয়, আমাদের—যারা ভক্তির অভাবে সত্যদর্শনের দৃষ্টি থেকে হয়ে আছি বঞ্চিত।

মহর্ষি রমণের বন্ধনহীন জীবনের যে অধ্যায়টি তাঁর জননীর মৃত্যুর সংগে সংগে সমাপ্ত হ'ল—বর্ত্তমান আশ্রমের সূত্রপাত অনুসন্ধান করতে হ'লে আবার সেই অধ্যায়ে ফিরে যেতে হয়। জননী দেহ রাখলেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। ঘটনাটি ঘট্‌লো ভক্তমণ্ডলীর প্রথম সংঘজীবনের কেন্দ্রস্থল—স্কন্দাশ্রমে। জীবন মৃত্যুর চিরন্তন লীলাপ্রবাহ এর অনেক আগেই মহর্ষির কাছে অর্থহীন হ'য়ে গিয়েছিল। জননীর মৃত্যুকে তিনি যে অতি সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছিলেন সে কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। মায়ের আগমনের সংগে সংগে পূর্বেকার আবাস বিরুপাক্ষ গুহা ছেড়ে মহর্ষি এসেছিলেন স্কন্দাশ্রমে। মাতৃবিয়োগের সামান্য কিছুদিন বাদেই স্কন্দাশ্রমে

বসবাসের পালা তিনি সাংগ ক'রে দিলেন। এর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ কতটুকু আছে বলা যায় না। ঘটনাটি ঘট্‌লো এইভাবে।

মহর্ষি জননীর মহাপ্রয়ানের পরে ভক্তমণ্ডলী তাঁর সিদ্ধদেহ সমাধিস্থ কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌লেন। কাব্যকান্ত গণপতি শাস্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানে সহায়তা কর্‌লেন। আশ্রমজননীর দেহ সকলে মিলে বহন ক'রে নিয়ে গেলেন অরুণাচল পর্বতের ওপারে—পলীতীর্থম্ পুষ্করিণীর তীরে। দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকে দলে দলে পল্লীবাসীগণ এসে এই উৎসবে যোগ দিলেন। গোড়া থেকে কোন রকম সমারোহের আয়োজন না থাকা সত্বেও দেখা গেল সংবাদটি মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়ে যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছে। যথারীতি শাস্ত্রসম্মতভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। মহর্ষি স্বয়ং সমাধিস্থলে অবস্থান ক'রে জননীর শেষ কৃত্য পর্যবেক্ষণ কর্‌লেন। সমাধিস্থলে বেদী গেথে শিবলিংগের প্রতিষ্ঠা হ'ল। মাতৃভূতেশ্বর শিবরূপে সেই লিংগদেবতার নিত্যপূজার ব্যবস্থা এ যাবৎ চলে আস্‌ছে।

উৎসবের অবসানে আর সকলের সংগে মহর্ষিও স্কন্দাশ্রমে ফিরে গেলেন। কিন্তু সামান্য কয়েকদিন পরেই মহর্ষি ফিরে গেলেন মায়ের সমাধিস্থলে এবং সেইখানেই রয়ে গেলেন। শূন্য স্কন্দাশ্রম ছেড়ে মহর্ষির ভক্তমণ্ডলী একে

এক্কে সকলেই মহর্ষির সন্নিধানে এসে সমবেত হ'লেন। এই খানেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্‌লো বর্ত্তমান আশ্রম।

আশ্চর্য এই গড়ে ওঠার বিবরণ। অর্দ্ধশতাব্দী কাল ধরে মহর্ষি রয়েছেন অরুণাচল পর্বতের সীমানায়। এর মধ্যে সারা পৃথিবীর বুকে কত যে ভাঙাগড়া ঘটে গেছে তার হিসাব নেই। স্রোতের জলের মত; দিনের পর দিন, কত কামনা কত বেদনার বোঝা মাথায় নিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী মহর্ষিকে এসে দর্শন ক'রে গেছে। কেউ এসেছে পাশের গ্রাম থেকে, কেউ বা এসেছে পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে। কেউ এসেছে অকৃত্রিম শ্রদ্ধায়, কেউ এসেছে নিছক কৌতুহলে। এসেছে নিঃস্ব পথের কাঙাল, এসেছে ধনকুবের। কেউ দেখেই চলে গেছে, কেউ বা আরও ভাল করে দেখ্‌বার জন্য কয়েক দিনের জন্য আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করেছে। আরও এক দল, মধুর পাত্রে যেমন করে মক্ষিকা ধরা পড়ে যায়, তেমনি করে গেছে জড়িয়ে। কত দেশের, কত ধর্মের, কত জাতের, কত ভাষার, কত প্রকৃতির মানুষ এখানে এমনি করে বাঁধা পড়ে আছে। অথচ মহষির এই আশ্রমে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কোনরূপ প্রচেষ্টা নেই। সত্য আছে। প্রত্যেকটি মানুষের বুকের ধন সেই সত্য। আচার বিচারের সাম্প্রদায়িক সমস্যা বা ব্যক্তিগত রীতিনীতির প্রশ্ন এখানে ওঠে না। এ যেন এক পার্বত্য প্রবাহ—এ

যেন এক জীবনের ধারা। যার প্রয়োজন আছে সে আসে। অঞ্জলি ভরে পান করে পরিতৃপ্ত হ'য়ে চলে যায়। ঝর্ণার নিজের কোন প্রয়োজন নেই।

রমণাশ্রমে যে যখন এসেছে, এই কথাটাই তার মনে হয়েছে। কোন মানুষের কাছে মহর্ষির কোন প্রয়োজন নেই। এ আশ্রম যেন অপ্রয়োজনের একটা খেলাঘর। কারুর আসা যাওয়ায় মহর্ষির কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তিনি কখনো কোন লোককে আসতেও বলেন না, কোন লোককে যেতেও বলেন না। কামনাও নেই, যাচ্ঞাও নেই। আশ্রমে যারা আসে—তাদের প্রত্যেকের জন্যই সহজ অভ্যর্থনা আছে; কিন্তু কারুর জন্যই বিশেষ আবাহন নেই। বিজ্ঞাপনও যেমন নেই, কোলাহলও তেমনি নেই।

অথচ রমণাশ্রমে উৎসবের অভাব নেই। এই সব উৎসবে সমারোহও বড় কম হয় না। কার্তিকী উৎসবে, জন্মদিনের জয়ন্তী দিবসে এবং মাতৃপ্রয়াণের মহাপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসরেই অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। হাজারে হাজারে দেশ-দেশান্তরের অতিথি অভ্যাগত ভোজ্য পানীয় লাভে পরিতৃপ্ত হয়। বাদ্যে, সংগীতে, সংকীর্তনে, আলোকে-পুলকে, বহুকণ্ঠের উল্লসিত কলরবে অরুণাচলের পাদদেশ হ'য়ে ওঠে মুখরিত। এই সমস্ত উৎসবের কালে মহর্ষিকে দেখে মনে হয় তিনিও যেন বহু অতিথির মধ্যে নিজেও একজন অতিথি। প্রত্যেকের অভাব অভিযোগের

প্রতি তাঁর দৃষ্টি থাকে। তিনি নিজে আহারে বসেন সকলের শেষে।

জন্মদিনের জয়ন্তী উৎসবে পুষ্পমাল্যের স্তূপ জমে যায়। মাল্য চন্দনে বিভূষিত ক'রে আল্পনা-আঁকা উৎসব-বেদিকায় মহর্ষিকে এনে বসানো হয়। সুবোধ শান্ত শিশুর মত মহর্ষি সভায় এসে বসেন। তাঁর চারিদিকে এই দিনটিতে যেন আনন্দের হাট ব'সে যায়। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকেরা অতিথি সৎকারের সেবাকার্যে এসে যোগ দেয়। এদের মধ্যে স্থানীয় বিদ্যায়তনের শিক্ষক ও ছাত্রেরাই হয় অগ্রণী।

আশ্রমের প্রাত্যহিক ব্যবস্থার মধ্যেও মহর্ষির জন্য কোনরকম বিশেষ বন্দোবস্ত হবার উপায় নেই। নিজস্ব বল্‌তে যাঁর কিছু নেই, সবার অন্তরে অন্তর্যামীরূপে যাঁর অধিষ্ঠান—তিনি কেমন ক'রে নিজেকে আর সকলের কাছ থেকে আলাদা ক'রে দেখ্‌বেন? সমস্ত মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের মাঝখানে যাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত সত্বার নিঃশেষে মৃত্যু হয়েছে, তিনি আর নিজের বিশিষ্ট খণ্ড-সত্বাটুকুর পরিচর্যা করবেন কি ক'রে? তাই দেখি মহর্ষি রমণ আশ্রমের যাবতীয় ব্যাপারেও 'সবার মাঝে, সবার সাথে'—আর সকলের মতই থাকেন। আশ্রমে শত শত অতিথি যখন খেতে বসে, তিনিও বসেন তাদের মাঝখানে, তাদেরই পাশটিতে। সবাইকার খাওয়া সুরু হ'লে তবে তিনি নিজে খেতে আরম্ভ করেন। সবাই যা খায় তার অতিরিক্ত কোন বস্তু তাঁকে দেবার উপায় নেই।

হয়তো কোন ভক্ত, মহর্ষির এই নিয়ম নিষ্ঠার কথা না জেনে, বিশেষ ক'রে মহর্ষির জন্যই, কোন একটি সুখাদ্য নিয়ে হাজির হ'ল। পরিমাণে বেশী থাক্‌লে সেই খাদ্যটুকু সমবেত মণ্ডলীর প্রত্যেকটি লোককে সমানভাবে বণ্টন ক'রে দিয়ে, নিজে আর সকলের মত একটি ভাগ গ্রহণ কর্‌বেন। আর যদি সেভাবে ভাগ করা সম্ভব না হয়, সে খাদ্য মহর্ষি স্পর্শও করেন না। মহর্ষির সম্মুখে কেউ হয়ত সামান্য একটু খাদ্য বা পানীয় এনে রাখ্‌লো। ভক্তের একান্ত ইচ্ছা মহর্ষি স্বয়ং এই শ্রদ্ধার দানটুকু গ্রহণ করেন। মহর্ষি বল্‌লেন—"তোমার খাবার না খেয়েও ত' আমি ভালই আছি। সবাই যদি না খায়, আমিই বা একা এ খাবার খাবো কি ক'রে? তার চেয়ে এক কাজ করো—ছেলেরা আছে, তাদের দিয়ে দাও। তারা খেলেই আমার খাওয়া হ'ল।" এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে মহর্ষির পরিভাষায় 'ছেলেরা' বল্‌তে সুধু মানব সন্তানদের বোঝায় না। আশ্রমের পোষ্য হিসাবে যে কুকুরের দল বংশানুক্রমে এখানে বসবাস ক'রে প্রধানত তাদেরই বোঝায়।

আহার সম্বন্ধে মহর্ষির নীতি হ'ল সন্তোষ। খাদ্যদ্রব্য ভালো কি মন্দ এ বিষয়ে তাঁর বিচার নেই। ভালো লাগছে কি লাগছেনা তা তাঁর খাওয়ার ধরণ দেখে কোনদিনই বোঝবার উপায় থাকে না। কিন্তু কোন কারণে, কোন অবস্থায় একটি নিয়মের ব্যতিক্রম কখনো কেউ ঘট্‌তে দেখে নি।

পাতের খাবার ফেলে রেখে কখনো তিনি উঠে যান নি। ছেলেবেলা থেকে অতি নিষ্ঠাভাবে তিনি এই একটি নিয়ম পালন ক'রে আসছেন যে, কম হোক, বেশি হোক, পরিবেশিত খাদ্য তাঁর পাত্রে অভুক্ত অবস্থায় কখনো পড়ে থাকবে না। এর ফলে, দৈবাৎ কোনদিন যদি তাঁর পাতে অধিক খাদ্য পড়ে যায়, সে দিন মহর্ষিকে বিব্রত বড় কম হ'তে হয় না। কিন্তু এমনতর অবস্থায় পড়েও, অসীম ধৈর্যে তিনি শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত গলাধঃকরণ ক'রে তবে আসন ছেড়ে ওঠেন।

ইতিপূর্বে জন্মতিথি উৎসবের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে একটি প্রশ্ন জাগ্‌তে পারে। মহর্ষি—যাঁর মানবীয় সত্বার কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই—তাঁকে উৎসব বেদীতে বসিয়ে, পুষ্পমাল্যচন্দনে বিভূষিত ক'রে লোক সমক্ষে খাড়া কর্‌বার সার্থকতা কোথায়? দেহ নামক বস্তুটিকে যিনি স্বীকারই করেন না তিনি এই সব লৌকিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন কেন? এর উত্তরে এই উৎসব অনুষ্ঠানের গোড়ার দিকের ইতিহাস বল্‌তে হয়। জন্মতিথি উৎসবের পরিকল্পনা করেছিলেন মহর্ষির ভক্তমণ্ডলী ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। মহর্ষি বল্‌লেন,—"না, এ উৎসবের কিছুমাত্র অর্থ হয় না। জন্ম এমন একটা ব্যাপারই নয় যা নিয়ে সমারোহ ক'রে উৎসব জমানো যায়। আমাকে তোমরা এর মধ্যে জড়িও না।"

কিন্তু ভক্তদের উৎসাহ ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তাঁরা কিছুতেই হাল ছাড়তে চাইলেন না। সকলে মিলে মহর্ষিকে অনুরোধ উপরোধে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুল্‌লেন। কথায় কিছু হবে না মনে ক'রে মহর্ষি কাগজে কলমে দিলেন এর উত্তর ঃ

"তোমরা—যারা উৎসব করে জন্মতিথি পালন করতে চাও,
জন্মের মূল কোথায় তারই আগে অনুসন্ধান করো।
সেই হল জন্মতিথি—যেদিন জন্ম-মৃত্যুর অতীত লোকে,
অনন্ত সত্বায় মানুষ ক'রে প্রবেশ লাভ।
"যে দিনটিতে মানুষ সংসারে এসে জন্মলাভ করে, অন্তত
সেই জন্মতিথির দিনটিতে তার উচিত এই জন্মের জন্য
শোক করা।
এ নিয়ে উৎসবের গৌরব কর্‌লে ব্যাপারটা হয়ে ওঠে
যেন মহানন্দে শবদেহকে অলংকৃত করার মত অর্থহীন।
অনুসন্ধান ক'রে নিজেকে খুঁজে বার করা এবং তার মধ্যেই
অবগাহন করা—একেই বলে জ্ঞান।"

শেষ পর্যন্ত এতেও কোন কাজ হ'ল না। ভক্তরা বল্‌লেন—"আমরা ত এখনো জ্ঞানী হ'য়ে উঠিনি। অতএব জন্মদিনে আমরা জন্মেরই উৎসব কর্‌বো। মহামানবকে আমরা পেয়েছি আমাদের মাঝখানে এই দিনটিতে। আনন্দে কর্‌বো আমরা এই পবিত্র দিনটির সম্বর্দ্ধনা। যে দেহে

পরম চৈতন্যের অধিষ্ঠান হয়েছে সে দেহ যদি শবদেহ হয় তবে সেই শবদেহকেই আমরা বিগ্রহের মত ক'রে পুষ্পচন্দনে সাজাবো। পূজার অধিকার যখন অজ্ঞানেরও আছে তখন আপনিই বা বাধা দেবেন কেন?"

মহর্ষিকে হার মান্‌তে হলো। জন্মোৎসবের বাৎসরিক ব্যবস্থা কায়েমী হ'য়ে সেই থেকে এখনো পর্যন্ত সমভাবে চ'লে আস্‌ছে। অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে মহর্ষি ভক্তদের ভক্তির অত্যাচার থেকে এইটুকু রেহাই পেয়েছেন যে—এই সমস্ত বিশেষ দিনেও রমণাশ্রমের ভক্তবৃন্দ ষোড়শোপচারে মহর্ষির পূজার দাবী করেন না। পাছে বেশি জেদ করলে ভক্তেরা এই সুবিধাটুকুও প্রত্যাহার করে তাঁকে নিয়ে যা খুসি তাই কর্‌তে সুরু করে, সেই ভয়ে মহর্ষি আর কথা বলেন নি। ভক্তের হাতে পড়ে সময়ে সময়ে ভগবানকেও ত' বড় কম নাকাল হতে হয় না!

উৎসবের দিন ছাড়া অন্যান্য সব দিনেও মহর্ষির নিজস্ব বলে কোন স্থান বা কোন ক্ষণ নেই। দিবারাত্রির মধ্যে প্রায় কোন সময়েই তিনি লোকচক্ষের আড়ালে থাকেন না। তাঁর কাছে সকলেরই অবাধ গতি। তাঁর কাছে যেতে কোনরকম অনুমতির প্রয়োজন হয় না। যে কোন লোক যে কোন সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হ'তে পারে। অধিকারের দিক দিয়ে কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়।

দুঃখ সুখের কথাগুলি তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করতে কারুরই বাধা নেই। একঘর লোকের মাঝখানে মহর্ষি প্রায় সারাক্ষণই ব'সে থাকেন। লোকে যেমন খুসি আসে, বসে —যতক্ষণ খুসি থাকে, আবার ইচ্ছা হলেই উঠে যায়। কেউ বা স্তুতিপাঠ ক'রে, কেউ বা শাস্ত্র আবৃত্তি ক'রে, কেউ বা কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—কেউ বা নিঃশব্দে তাঁর মুখের পানে চেয়ে বসে থাকে। মহর্ষি কখনো বা দু' একটি কথা বলেন—হয় তামিল, নয় ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে। কখনো বা স্তব্ধ ভাবে নিঃশব্দে বসে থাকেন। কিন্তু মহর্ষির সান্নিধ্য যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা সকলে একবাক্যে এই কথাই বলেন যে নিঃশব্দে থেকেও মহর্ষি তাঁর চারিপার্শ্বে বাণীর বার্তা বিকীরণ করেন। সে বাণী কান দিয়ে হয় ত শোনা যায় না কিন্তু অন্তরের গভীরে গিয়ে সেই বাণী ভাষাতীত প্রেরণায় ঝংকৃত হ'য়ে ওঠে।

চিরদুঃখিনী লক্ষ্মী অম্মলের জীবন কাহিনীর উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। মহর্ষির বিবরণ যে সময়ে তাঁর কানে প্রথম এসেছিলো তখন তিনি শোকে দুঃখে মুহ্যমান হ'য়ে ছিলেন। বেঁচে থাকার কোন অর্থই তাঁর কাছে ছিলো না। এমন সময়ে কে যেন কোথা থেকে এসে তাঁকে পরমতম আশ্বাসের অভয়মন্ত্র শুনিয়ে গেল। লক্ষ্মী অম্মল ছুটে এল মহর্ষির নাম শুনে। কিসের লোভে এল

তা সে নিজেও ভাল করে জানে না। "অরুণাচল পাহাড়ে আছেন এক মৌন তপস্বী—তিনি কারুর সংগে বাক্যালাপ করেন না! অথচ লোকে তাঁর কাছে এসে জীবনের সব দুঃখ ভুলে যায়।" জনৈক শুভানুধ্যায়ীর মুখে এইটুকু মাত্র লক্ষ্মী অম্মল শুনেছিলেন। শোনার সংগে সংগে কেমন ক'রে যেন তাঁর মনে বিশ্বাসের চেয়ে বড় কি একটা সত্যানুভূতি জেগে উঠেছিল।

প্রথম সাক্ষাতের কালে মহর্ষি ছিলেন মৌন। লক্ষ্মী অম্মলেরও তখন কথা বলার মত অবস্থা ছিল না। কিন্তু এরই মধ্যে মহর্ষি তাঁর যা দেবার তা দিলেন, লক্ষ্মী অম্মলও তাঁর যা কিছু প্রাপ্য নিঃশেষে বুঝে পেলেন। লক্ষ্মী অম্মলের বুকের মধ্যে জ্বল্‌ছিলো যে শোকের আগ্নেয়গিরি, যেন কোন্ মন্ত্রবলে সেই উত্তাপ গেল শান্ত হ'য়ে। বিগত দিনের দুঃখ শোকের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত তাঁর মন থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। এই অলৌকিক রূপান্তরের রহস্য সহজবুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করা না গেলেও, এই ঘটনায় মহর্ষি রমণের অত্যাশ্চর্য প্রভাব খানিকটা অনুমান করা যায়।

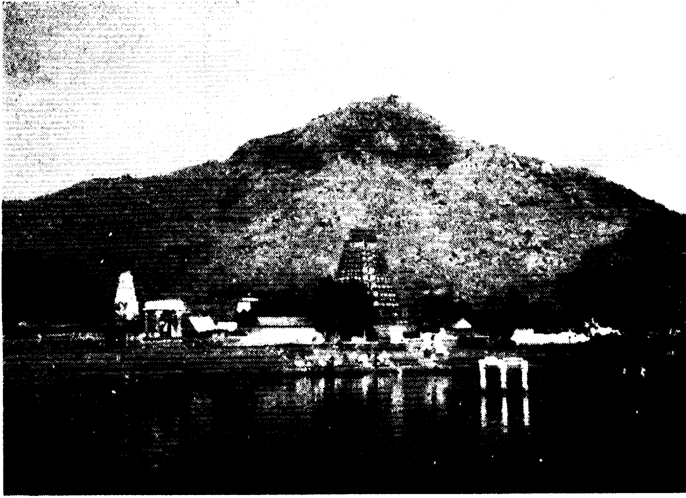
মহর্ষির জীবনকাহিনীর মধ্যে যাদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা বেশি নয়। লক্ষ্মী অম্মলের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে যদিও ভাগ্যক্রমে একটি মাত্র লক্ষ্মী অম্মলের সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা পেয়েছি, মহর্ষি



প্রথম সাধন কুটীর



যে বৃক্ষতলে মহর্ষি সাধনার আসন পেতেছিলেন



অদূরে অরুণাচল পর্ব্বত



তিরুভান্নামালাইয়ের সেই পথ—
যে পথ দিয়ে মহর্ষি এসেছিলেন, কিন্তু আর কখনো ফেরেন নি

রমণের নিঃশব্দ তপস্যার জীবনের সংগে, লোকচক্ষের অন্তরালে, হয়তো বা সহস্র সহস্র লক্ষ্মী অম্মল আছে জড়িয়ে। কেউ এদের চেনে না—কারণ মানুষ চেনা যে পথ দিয়ে সাধারণত চলে তা হ'ল বাইরের দৃশ্যজগতের ঘটনাবহুল রাজপথ। সে পথ মহর্ষি বা তাঁর অতি নিকটের লোকগুলির কাছে কোনদিনই পরিচিত নয়। জীবনের যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত, বিপর্যস্ত হ'য়ে যারা শেষ পর্যন্ত মহর্ষির চরণে এসে আশ্রয় নেয়, তারা তাদের পরমপ্রাপ্তির ইতিকথা কৃপণের ধনের মত ক'রে অতি সংগোপনে অন্তর দিয়ে ঢেকে নিয়ে নিঃশব্দে আত্মগোপন ক'রে থাকে।

যে দু'একজন ভাগ্যবানের কথা লোকপরম্পরায় ক্বচিৎ জানা যায় তাদের মধ্যে শান্তাম্মলের কাহিনী বহুকারণে উল্লেখযোগ্য। প্রৌঢ়া বিধবা এই মহিয়সী রমণীর জন্মস্থান ছিল রামনাদে। দূর থেকে মহর্ষির অনুপম তপস্যার কিছু কিছু বিবরণ তিনি শুনেছিলেন। কেমন ক'রে যেন মহর্ষির চিত্র সম্বলিত জীবন-কাহিনী তাঁর হাতে এসে পড়েছিল। বইখানি পড়ে তাঁর মনে হ'ল তিনি যেন তাঁর জীবনের উপাস্য দেবতার সন্ধান পেলেন। মনে হ'ল এই পরমাশ্চর্য গ্রন্থ-খানির পাতায় পাতায় যে সব ঘটনার উল্লেখ আছে তার প্রত্যেকটি সত্য; যাঁর কথা লেখা আছে তিনি যেন সমস্ত ঘটনাকে ছাপিয়ে সত্য-স্বরূপ হ'য়ে উঠেছেন। বই থেকে

মহর্ষির ছবিখানি বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে, ইষ্টদেবতার স্থলাভিষিক্ত ক'রে শান্তাম্মল তাঁরই পূজা করতে লাগলেন।

অত্যল্প কালের মধ্যেই ছবিখানি তাঁর অন্তরলোকে জীবন্ত হ'য়ে উঠলো। জাগ্রত অবস্থায় ধ্যানরূপে, নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নযোগে, তিনি আনন্দ সাগরে মহর্ষির প্রসাদে অবগাহন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এমন হ'য়ে উঠলো তাঁর ভক্তির আকর্ষণ যে গৃহসংসার সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে তিনি রমণাশ্রমে —তাঁর কামনার স্বর্গলোকে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

সেখানে গিয়ে সমগ্র মনপ্রাণ ঢেলে তিনি মহর্ষির সেবা ও আশ্রমের পরিচর্যায় করলেন আত্মনিবেদন। কয়েকটি —বৎসর ধ'রে চললো এই আত্মবিলুপ্ত তপশ্চর্যা। এই সময়ের মধ্যে, কথিত আছে, তিনি বহুবিধ আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করেছিলেন। . উন্মীলিত অথবা নিমীলিত চক্ষে তিনি সদাসর্বদাই অপরূপ জ্যোতির দর্শন পেতেন। কখনো বা দেখতেন জ্যোতির্ময় শুভ্ররূপে মহর্ষি তাঁর চোখের সাম্‌নে বিরাজ করছেন। এই সমস্ত অলৌকিক দর্শনের কাহিনী তাঁর মুখে শুনে মহর্ষি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভংগীতে বলেছিলেন—"মনঃকল্পিত এই সব দর্শনকে আমল দিয়ো না। মনের খেলা ছাড়া এগুলি আর কিছুই নয়। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল আত্মজ্ঞান লাভ। এরাই তার প্রতিবন্ধক। চোখের সাম্‌নে যা ঘটবার ঘটে যাক্। তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোন হেতু

নেই। চঞ্চল মনের পিছনে আছে যে অচঞ্চল স্থির সত্বার গভীর লোক—সেইখানে পৌঁছে তোমাকে স্থিতিলাভ করতে হবে! সেই কথা মনে রেখে, এই সমস্ত ক্ষণচঞ্চল দৃশ্যপটকে অতিক্রম ক'রে তোমাকে অগ্রসর হ'তে হবে।”

শান্তাম্মলের জীবনে মহর্ষির ধ্রুব নির্দেশ সত্যে পরিণত হয়েছিল। মহর্ষি নির্দিষ্ট পথে তিনি পরম শান্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন।

প্রসংগ ক্রমে, মহর্ষির জীবনধারার সহিত অংগাংগী ভাবে জড়িত না হলেও, আর একটি অদ্ভূত মানুষের কথা এর আগেই বলা উচিত ছিল। মানুষটির নাম শেষাদ্রি বা শেষাদ্রিস্বামী, পরিচয়—বলার মত কিছু নয়। উত্তর আর্কট জেলায় তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। পিতামাতা কতদিন বেঁচে ছিলেন সে খবর জানা যায় না। শেষাদ্রি মানুষ হয়েছিলেন মায়ের মামার বাড়ী। সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন পুরানে বেশ খানিকটা বুৎপত্তিও লাভ করেছিলেন। বালক বয়সেই তিনি কামাক্ষী দেবীর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং মাত্র সতেরো বছর বয়সেই গৃহসংসারের আবেষ্টন পরিত্যাগ করে শ্মশানে মশানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। দিনের পর দিন যেখানে সেখানে পড়ে থেকে এই বালক তপস্বীর আকৃতি প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল পাগলের মত। না ছিল আহারের, না ছিল বাসস্থানের কোন ঠিক ঠিকানা। শোনা যায় তিনি

নাকি শক্তি সাধনায় সিদ্ধির পথে অনেকদূর এগিয়েছিলেন এবং কিছু কিছু শক্তির স্ফুরণও না কি তাঁর মধ্যে এই বয়সেই দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু এই মানুষটির হাব ভাব ধরণ ধারণ দেখে লোকে এঁকে পাগল বলেই ধরে নিয়েছিল। লোকেরও দোষ দেয়া যায় না। অনাহারে, অনিদ্রায়, কখনো গাছ তলায় কখনো গোরস্থানে পড়ে থেকে থেকে চেহারাটি হয়ে উঠেছিল সত্যিই অপরূপ। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলের বোঝা, পরনে শতচ্ছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ড দেখে ছোট ছোট ছেলের দল লাগলো এঁর পিছনে। ফলে, বিষম বিরক্ত হয়ে শেষাদ্রি জন্মভূমির মমতা ত্যাগ করে দেশ দেশান্তরে ভবঘুরের মত ঘুরতে ঘুরতে অরুণাচলের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর গৃহহীন বন্ধনহীন মন এই স্থানটির আকর্ষণে বাঁধা পড়ে গেল।

মহর্ষি রমণের জন্ম হয়েছিল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর। শেষাদ্রি মহর্ষির চেয়ে নয় বৎসরের বড়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যখন শেষাদ্রি অরুণাচলের ছায়ায় এসে উপস্থিত হলেন তখন মহর্ষি বালক মাত্র। তখনো মহর্ষির কাছে অরুণাচল পর্বত স্বপ্নের মত সুদূর। কিন্তু যখন দেখা যায় চির উদাসীন, অনন্তকালের পথিক—এই ক্ষ্যাপা মানুষটি ঘুরতে ঘুরতে এসে, মহর্ষির আগমনের ছয় বৎসর আগে

থেকে সেই অরুণাচলেই রইলেন জড়িয়ে, তখন কেমন করে যেন মনে হয় এই দু'জনের মধ্যে কি একটা অস্ফুট যোগাযোগের সূত্র ছিল। দু-জনে দু-পথ দিয়ে এলেন সেই একই রঙ্গমঞ্চে। প্রায় একই বয়সে দুজনের বুকে দোলা দিল নাম-না-জানা অরূপের বিপুল আকর্ষণ। নেপথ্যে যেন কি একটা নিগূঢ় ষড়যন্ত্র চলছিলো এই দুটি অসামান্য মানুষকে কেন্দ্র করে। এর অতিরিক্ত আর কিছু জোর করে বল্‌বার উপায় না থাকলেও এদের সম্বন্ধটি লক্ষ্য করে দেখবার মত।

অরুণাচলের নামটি মাত্র শুনে, বালক রমণ উন্মাদের মত যখন এই অরুণাচলের বক্ষে এসে আশ্রয় নিলেন— তখন বিশাল বিশ্বে তিনি নিঃসংগ, একক। মুণ্ডিত মস্তক, কৌপীনধারী এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে শিশুবালকের দল পুলকিত হয়ে উঠ্‌লো। ইতিপূর্বে তাদের মজার আসর জমিয়ে রেখেছিলেন শেষাদ্রি। এবার তারা আর একটি নতুন খেলনা পেয়ে মহানন্দে মেতে উঠ্‌লো। শেষাদ্রির গায়ে ইট্‌পাটকেল ছুঁড়লে শেষাদ্রি চুপ করে সহ্য করতেন না। কাজেই শেষাদ্রিকে নিয়ে এই খেলা একেবারে নিরাপদ ছিল না। কিন্তু মৌন মহর্ষির বাহ্যজ্ঞান ছিলো না বল্‌লেই হয়। অতএব খেলাটা সহজেই জমে উঠ্‌তো। মহর্ষি নির্বাক নিস্পন্দ অবস্থায় সহস্রস্তম্ভ মন্দিরের প্রাঙ্গনে বসে থাকতেন

আর ছোট ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে মনের সুখে তাঁর সারা দেহে ধূলা বালি বর্ষণ করে মজা দেখতো।

এই সময়ে, লোহা যেমন করে চুম্বকের টানে তার কাছে সরে আসে, শেষাদ্রি গ্রহণ করতেন তাঁর দেহরক্ষার দায়িত্ব। মহর্ষি অচেতন হয়ে অবস্থান করতেন এবং মাতা যেমন করে সন্তানের প্রতি সজাগ সতর্ক দৃষ্টির প্রহরায় নিযুক্ত থাকেন, ঠিক তেমনি করেই শেষাদ্রি তাঁর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ত্তব্য করে যেতেন। মহর্ষির আসল পরিচয়টি সম্পূর্ণ না হলেও, কিছুকিছু হয়তো শেষাদ্রি জান্‌তেন। অন্ততঃ তাঁর কথাবার্তার ভাবভংগী থেকে এই কথাটাই মনে হয়।

শেষাদ্রি যে কোনদিন মহর্ষির খুব কাছাকাছি এসেছিলেন বা নিবিড়ভাবে তাঁর সাহচর্য লাভ করেছিলেন এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে, নিজের দেহটি পর্য্যন্ত যাঁর কাছে নিজের বলে মনে হয় নি, তাঁর সম্পর্কে এ কথা ওঠে না। মহর্ষির কাছাকাছি আসার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর তথাকথিত পার্শ্বচরবৃন্দের মধ্যেই বা পেয়েছেন কয় জন? এ কথাও ঠিক যে শেষাদ্রিও যেন একটু দূরে দূরে, আড়ালে আড়ালে থাকতেই পছন্দ করতেন! যাদের প্রতি তিনি প্রসন্ন হতেন তাদেরই টেনে আনতে চাইতেন মহর্ষির সন্নিধানে। তাঁকে যারা শ্রদ্ধা করতো—তাদের সবাইকে তিনি মহর্ষির দিকে ঠেলে দেবার জন্য

আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। বল্‌তেন—"আমার কাছে নয়! আমি যাঁর ছোট ভাই, তাঁর হাতে আছে অমৃতের পূর্ণ পাত্র। আমি বল্‌ছি, তোমরা তাঁরই শ্রীচরণে গিয়ে আশ্রয় নাও!"

ভাবতে ভাল লাগে এই স্বাভাবগম্ভীর স্বল্পভাষী চির উদাসীন অদ্ভুত মানুষটির কথা। মহর্ষির কাছে শেষাদ্রির নিজস্ব চাওয়া পাওয়ার পরিমান কতখানি তা জান্‌বার উপায় নেই। কোনরকম ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা না করেও শেষাদ্রি যেমন করে দূরে থেকেও মহর্ষির এতটুকু সেবা, এতটুকু আনুকূল্য করতে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতো, তাতে মনে হয় যে এই দুটি মানুষের মাঝখানে সবার দৃষ্টির আড়াল দিয়ে নিরন্তর প্রবাহিত হত একটি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা। অন্তরঙ্গতার বহিঃপ্রকাশ ছিলো না বলেই হয়তো বা এই দুজনের সম্বন্ধটি যেন সৌন্দর্যে মাধুর্য্যে অধিকতর রমণীয় হয়ে ওঠে।

লিখিত বর্ণনায় যতটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তাতে মহর্ষির সংগে শেষাদ্রির কথোপকথনের একটুখানি নমুনা এইরূপ। ঘটনাটি বল্‌বার আগে প্রথমেই জানা দরকার যে শেষাদ্রির মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতার স্ফুরণ পরিদৃষ্ট হত। তিনি অভ্রান্ত ভাবে লোকের মনের কথা জান্‌তে পারতেন এবং অনেক সময়ে তাঁর এই আশ্চর্য ক্ষমতার

পরিচয় পেয়ে লোকে স্তম্ভিত হয়ে যেতো। মহর্ষি যে সময়ে আম্রকুঞ্জে অবস্থান করছেন সেই সময়ে একদা সন্ধ্যাকালে শেষাদ্রি, কি মনে করে, মহর্ষির সামনে এসে বস্‌লেন। কিছুক্ষণ আপন মনে চিন্তা করে শেষাদ্রি স্বগতোক্তি করলেন —"এ লোকটির মনের খবর কিছুই বোঝবার উপায় নেই!"

মহর্ষি পূর্বের মত রইলেন নিস্তব্ধ হয়ে। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষাদ্রি পুনরায় স্বগত ভাবে বললেন—"অরুণাচলকে পূজা করলে তিনি মুক্তি দেবেন।" কথাগুলি খাপ্‌ছাড়া, ধরণটিও জিজ্ঞাসার নয়। হঠাৎ এ কথা কি প্রসংগে এলো—কেন তিনি সহসা এই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন তাও পরিস্ফুট নয়। কিন্তু মহর্ষি এই উক্তিকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করতে পারলেন না। মহর্ষি বল্‌লেন—("পূজা যে করে সে কে, এবং পূজা যে গ্রহণ করে—সেই ব্যক্তিটিই বা কে?")

শেষাদ্রি হয়তো বুঝলেন যে তাঁর নিজের মনের ভাব মহর্ষির কাছে ধরা পড়ে গেছে। হো হো করে হেসে তিনি বল্‌লেন—"সেইখানেই ত হয়েছে বিপদ। সেই কথাটাই ত ঠিক ধরা যাচ্ছে না।"

মহর্ষি ধীর ভাবে তাঁর নিজের উপলব্ধিগত সমাধানের কথা বল্‌তে লাগলেন। অন্ধকার রাত্রি উৎকর্ণ হয়ে শুন্‌তে

লাগলো অদ্বৈতবাদের নিগূঢ় রহস্য। আম্রবনের পুঞ্জীভূত ছায়ার বক্ষে কখন এসে পড়লো এক ফালি জ্যোৎস্নার আলো। মহর্ষির কথা শেষ হল অনেক রাত্রে। শেষাদ্রি বিমূঢ় ভাবে সমস্ত কথা শুনলেন। শেষে বল্‌লেন—"কি জানি! এ সব কথার কিছুই যেন বুঝলাম না। (কার পূজা, কেন পূজা—কে পূজা করে, কেমন করে পূজা করে, তাও আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পারবো না। কিন্তু এ কথা অন্তত ঠিক যে আমি পূজা করি।")

কথা কয়টি বলে শেষাদ্রি নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করলেন। তারপরে, সেই ঘনান্ধকার বনচ্ছায়াতলে অরুণগিরির শিখরের উদ্দেশে ভূলুণ্ঠিত দেহে করলেন প্রণিপাত। একবার, দুবার, থেকে সুরু করে অসংখ্যবার এই ভাবে প্রণিপাত করে নির্জন গিরিপথ ধরে একা একা নিঃশব্দে ফিরে চলে গেলেন।

এর পরে আর একবার মাত্র শেষাদ্রির দেখা পাওয়া যায়—মৃত্যুর কোলে। মহর্ষি স্বয়ং তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

মহর্ষি এবং তাঁর পার্ষদগণের কাহিনী বল্‌তে গিয়ে, প্রসংগ ক্রমে আশ্রমের বিচিত্র ইতিহাসের কথাটিও বাদ দেওয়া যায় না। বলা বাহুল্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মহর্ষি রমণের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোনরকম প্রচেষ্টাই ছিল না। কোথা থেকে অনাহূত মানুষগুলি দেশ বিদেশের শ্রদ্ধা

প্রীতির অর্ঘ নিয়ে একে একে এসে হাজির হল—আর কেমন করে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে গড়ে তুল্‌লো বর্ত্তমানের আশ্রম তার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন। অরুণাচলের গুহায় বা আম্রকুঞ্জের পর্ণকুটীরে অবস্থান কালে মহর্ষির নিজস্ব প্রয়োজন বলে যেমন কিছু ছিল না, এখনো চলে তা আসছে ঠিক সেই একই ভাবে। যে আশ্রমের প্রথম অবস্থায় ছিল খড়ের চালাঘর, সেই আশ্রম যেন তার নিজের প্রয়োজনেই ধীরে ধীরে পাকা ঘরে পরিণত হয়েছে। আবেষ্টনের এই আমূল পরিবর্ত্তনের মাঝখানেও মহর্ষি কিন্তু যেমনটি ছিলেন ঠিক তেমনিটিই আছেন।

এই আশ্রমকে অক্লান্ত পরিশ্রমে যারা গড়ে তুলেছে তাদের পরিচয় কোথাও লেখা নেই। যারা পাহাড় কেটে মাথায় করে এনেছে পাথরের বোঝা, নিজের হতে কোদাল চালিয়ে তৈরি করেছে আশ্রমের উদ্যান, ইট কাঠ বালির সংযোগে গড়ে তুলেছে আশ্রম-গৃহ তারা কেউই সাধারণ শ্রমিক নয়। তাদের মধ্যে আছে ব্যবহারজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, রাজকর্মচারী, জমিদার, পুলিশের দারোগা, ডাক্তার বৈজ্ঞানিক এবং ছাত্র। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ত্যাগে, আত্মবিলুপ্ত শ্রদ্ধায়, বহুজনের প্রীতি-প্রসন্ন অন্তরের পরিপূর্ণ প্রেরণায় যে ভাবে রমণাশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—সে কাহিনী যারা জানে না তারা সহজে ধারণা করতেও পারবে না।

অথচ যাঁকে কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এই আশ্রম, তিনি যেন সবার মাঝে থেকেও রয়ে গেছেন সবার আড়ালে। আশ্রমে যত চিঠি আসে, আশ্রম থেকে যত চিঠি যায়—প্রত্যেকটি পায় তাঁর হাতের স্পর্শ। দিনের পর দিন আশ্রমে যারা আসে, তারা দেখে—মহর্ষি স্বয়ং যেন তাদেরই একজন। তিনি কারুর গুরু নন, কেউ তাঁর শিষ্য নয়। এ আশ্রমে মহর্ষি রমণের নিজস্ব বল্‌তে কিছু নেই। ক্ষণিকের পান্থশালায় আর সকলের যতটুকু অধিকার আছে—তার চেয়ে বেশী অতিরিক্ত কোন অধিকারের দাবী তাঁর নেই। আপনার কেই নেই, পরও কেউ নেই।

কিন্তু এই নির্বিকার নিরপেক্ষ ভাবটুকুই মহর্ষি চরিত্রের শেষ কথা নয়। একদিকে যিনি অতিমানব, আর এক দিকে তিনিই আবার মানবীয় করুণা ও কোমলতার অবতার। যে অখণ্ড অদ্বৈতবাদী আত্মসত্বার বহির্ভূত কোন কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না তাঁর স্নেহ-নির্ঝরিনী তুষার গলা বারিধারা অজস্রভাবে ঝরে পড়ে রমণাশ্রমের প্রত্যেকটি বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, নরনারীর উপরে সমভাবে। লক্ষ্মী নাম্নী আশ্রম ধেনুটির কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। মহর্ষির আদর পাবার লোভে এই সুরভি তাঁর পিছনে ঘুরে বেড়ায়। কাঠবিড়ালীরা নির্ভয়ে তাঁর কোলে উঠে খেলা করে। বন থেকে চিতাবাঘের বাচ্চারা বিড়ালছানার মত এসে এঁর

পায়ে লুটিয়ে পড়ে। বানর ও কুকুরগুলি মহানন্দে তাঁর চারিপাশে আনন্দের হাট বসিয়ে দেয়। মহর্ষি যদি কেবল শুষ্ক জ্ঞানীই হতেন, তা হলে তাঁকে ঘিরে এত আনন্দের উৎসব সম্ভব হত কি করে?

এ কথা অবশ্য ঠিক যে সচরাচর মহর্ষি আপনমনে একান্ত নিঃশব্দে থাকতেই ভালবাসেন। এই নির্জন মৌনতা কিন্তু ভাষাহীন নয়। প্রশ্ন ভারাক্রান্ত অন্তর নিয়ে যারা যখনই মহর্ষির কাছে গেছে, তারাই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে মহর্ষির মৌনতা তাদের অন্তরে গিয়ে কথা বলেছে। সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে দুটো চারটে ভাল ভাল জ্ঞানের কথা শুনে আসবার লোভ অনেকেরই থাকে। কিছু বা ধর্মালোচনা কিছু বা উপদেশ লোকে শুনতে চায়। হয় তো বা এরও প্রয়োজন এবং সার্থকতা আছে। মহর্ষির নিশ্ছিদ্র মৌনতায় হাঁপিয়ে উঠে একবার জনৈক আগন্তুক সোজাসুজি তাঁকে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "জানলে কি করে যে কথা বলি না? সভায় দাঁড়িয়ে কথার স্রোত বইয়ে দিলেই ত আর জানানো যায় না! জ্ঞান সংক্রামিত হয় মৌনতার মাধ্যমে। ঘণ্টাখানেক বসে, কান পেতে, কতকগুলি বাছাবাছা কথা শুনলেই ত' আর জীবনের চিরন্তন ধারাটি বদ্‌লে যায় না! শোনার সময়কার মনো-যোগ, বিযুক্ত মনের কাছে হয়ে যায় অর্থহীন। কিন্তু মৌনতার

প্রভাব নিঃশব্দে কায করে অন্তরের গভীরে। জীবনের ধারাটি যায় একেবারে বদলে। কথার মূলে আছে চৈতন্যসত্বা। মাঝখানে আছে চিন্তা। কথাও যখন থাকে না, চিন্তাও যখন স্তব্ধ হয়ে থাকে তখন চৈতন্যসত্বার শাশ্বত তরংগ বিস্তার করে তার ভাষাহীন বাণী। অন্তরের কূলে কূলে আছড়ে পড়ে সেই মৌনতার ভাবধারা। চৈতন্যে চৈতন্যে ঘটে বাণীর বিনিময়।”

শ্রীযুক্ত নীলকান্ত নামে জনৈক তামিল ভক্ত মহর্ষির সান্নিধ্যে এক রাত্রি অতিবাহিত করে সকালে উঠে দেখলেন মহর্ষি খুসি মুখে তরকারির ঝুড়ি সাম্‌নে নিয়ে কুট্‌নো কুট্‌তে বসেছেন। আশে পাশে তৃতীয় ব্যক্তিকে না দেখে নীলকান্ত আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “জগতের দুঃখ দুর্দশার প্রতীকার হবে কি করে?” বোধ হয় প্রশ্নকর্ত্তার মনের ভাবটি ছিল এইরূপ ঃ বুঝলাম এটি আশ্রম, মান্‌লাম আপনি মহর্ষি। এখানকার আকাশে বাতাসে আছে শান্তির প্রলেপ। এও স্বাভাবিক। স্বয়ং মহর্ষি হয়েও আপনি কুট্‌নো কুট্‌তে বসেছেন, তাও দেখতে পাচ্ছি। এখানে উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই, দুশ্চিন্তা নেই—কর্মজগতের কর্কশ কোলাহল নেই। কিন্তু সমস্ত জগতটা কিছু আর আশ্রম নয়। পৃথিবীতে দুঃখ আছে, বেদনা আছে। আর্ত্ত প্রপীড়িত জনগণের বেদনা-মথিত ক্রন্দনকে আপনি উপেক্ষা করতে পারেন না!

মহর্ষি মুখ তুলে চাইলেন। মুখভাবে আলো-ছায়ার মত জড়িয়ে ছিলো করুণার সংগে মেশা প্রচ্ছন্ন একটুখানি ব্যংগের হাসি। বল্‌লেন—"কোন্ জগতের কথা বল্‌ছো?"

নীলকান্ত বল্‌লেন—"বিশাল মানবতার কথা। সেখানে দুঃখের বোঝা হয়ে উঠ্‌ছে ভারী; শ্রমক্লান্ত পৃথিবী অসন্তোষে হয়ে উঠ্‌ছে জর্জরিত। এই বিপুল বেদনার কি প্রতীকার নেই?" মহর্ষি বল্‌লেন—"জগতের সমস্যার কথা ভাব্‌বার আগে আত্মসমস্যার মীমাংসা কি করলে, তাই বলো। দুঃখ কি তোমারই কিছু কম?" এ কথার উত্তরে বল্‌বার মত কিছু না পেয়ে নীলকান্ত নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

কথার জালে জড়িয়ে গিয়ে মানুষ যে অহরহই নিজের মনে সমস্যার জটিলতা গড়ে তোলে, একথা মহর্ষি জানেন বলেই শাণিত ব্যংগের খড়গাঘাতে তিনি অর্থহীন উচ্ছ্বাসের অতিশয়োক্তিকে মাঝে মাঝে এইভাবে করেন শাসন। আত্ম স্বরূপকে না জেনে মানুষ নেয় কল্পনার আশ্রয়। আপন মনে গড়ে আপন মনে ভাংগে। বাইরের চোখ দিয়ে দেখে গুরুকে, বাইরের দিকে চেয়ে আহ্বান করে ভগবানকে। সমস্যা কণ্টকিত দার্শনিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে অসার্থক গবেষণায় জীবনকে করে তোলে উদ্‌ভ্রান্ত। ত্যাগ বৈরাগ্যের, উচিত অনুচিতের ভূত ভবিষ্যতের ছলে মনের উপরে শাস্ত্রের

পরে শাস্ত্রের বোঝা চাপিয়ে যতই বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে—সত্যবস্তু, আত্মবস্তু ততই দূরে সরে যায়। বস্তুহীন পাত্রটিই তখন শূন্যতার সীমাহীন দম্ভে হয়ে থাকে অর্থহীন।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে স্বল্পভাষী মহর্ষিকেও এই ধরণের যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে তাদের সংখ্যা বড় কম নয়। সমস্ত প্রশ্ন এবং সমস্ত উত্তর এখানে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। অনেকের অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর ছাপার অক্ষরে প্রকাশিতও হয় নি। যে গুলি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে থেকে বেছে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য যে কয়েকটি এখানে দেওয়া হল—তা থেকেই মহর্ষির বিশিষ্ট বক্তব্য এবং বিশেষ ভংগীর খানিকটা আভাষ পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন হল—আত্মসত্বায় পৌঁছানো যাবে কি করে ?

উত্তরে মহর্ষি বল্লেন—"আত্মসত্বায় পৌঁছাতে হয় না। পৌঁছাবার কথা যদি থাকতো তাহলে বুঝতে হোতো যে আত্মসত্বা নামধেয় বস্তুটি এখানে বা এখন নেই, সে যেন এমন একটি বস্তু যাকে পাওয়ার বাকি আছে। যাকে পেতে হয় তাকে আবার হারাতেও হয়। এমনতর বস্তু অচির। স্থায়ী না হয়েই পারে না। আর, যা চিরদিন থাকবে না তাকে পেয়েই বা কি হবে ? সেই জন্যই আমি বলি, আত্মসত্বায় পৌঁছাতে হয় না। তুমিই ত আত্মসত্বা—আত্মসত্বাতেই ত তুমি রয়েছ প্রতিষ্ঠিত।"

"অতএব, উপলব্ধিতে অধিকার আছে প্রত্যেকটি মানুষের। যারা জানতে চায়, অধিকারের দিক দিয়ে তাদের প্রত্যেকেই সমান। উপলব্ধির যোগ্যতা তোমার আছে কি না—এই যে দ্বিধা, এবং তোমার উপলব্ধি হয় নি বলে এই যে ভ্রান্ত ধারণা—এই গুলিই হল বাধা। এই বাধাকে অতিক্রম করে যেতে হবে।"

প্রশ্ন হল—মোক্ষলাভে গৃহস্থের অধিকার কতখানি?

মহর্ষি উত্তর দিলেন—"নিজেকে তুমি গৃহস্থ বলেই বা ভাবো কেন? সন্ন্যাসী হলে তখনো ত তোমার মন জুড়ে এই ভাবটি থাকবে যে তুমি সন্ন্যাসী! গৃহেই থাকো বা বনেই থাকো, মন তোমাকে ভুতের মত করে পেয়ে থাকে। এই অহংকারই ত চিন্তার উৎস। এই থেকেই দেহের সৃষ্টি হয়, জগতের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তোমার মনে ধারণা জন্মায় যে তুমি গৃহস্থ। সংসার ত্যাগ করে যদি চলে যাও, তখনও বড় জোর, গৃহস্থ-চিন্তাটির স্থলে এসে হাজির হবে সন্ন্যাস-চিন্তাটি—গৃহের স্থান দখল করবে বন। কিন্তু মনের বাধাটি সেখানেও সমভাবে রয়ে যাবে। বরং, অভিনব আবেষ্টনে গিয়ে এই বাধা আরও বড় হয়ে উঠ্‌বে। পারিপার্শ্বিক বদ্‌লালে কি হবে? একমাত্র বাধা হ'ল মন। ঘরেই থাকো আর বনেই যাও—অপসারিত করতে হবে এই বাধাটি। যদি বনে গিয়ে বাধা সরানো যায়—তবে ঘরেই

বা তা সম্ভব হবে না কেন? তবে আর পারিপার্শ্বিক বদ্‌লাবার দরকার কি? এখনকার পরিস্থিতির মাঝে থেকেও ত চেষ্টা করতে পারো।

প্রশ্ন হল: এ জন্মের কর্ম কি পরজন্মে প্রতিফলিত হয়?

মহর্ষি বল্‌লেন: তুমি কি এখন জন্মেছ যে জন্মান্তরের চিন্তা তোমাকে পেয়ে বসেছে! আসলে জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। যার জন্ম হয়েছে সে-ই ভাবুক মৃত্যুর কথা অথবা মৃত্যুর প্রতিষেধকের কথা।

প্রশ্ন হল: নাম জপ করার কালে, মাঝে মাঝে ঘণ্টাখানেকের জন্য ঘুমের মত একটা ভাব এসে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। জেগে উঠে মনে পড়ে যে আমার জপে বিঘ্ন ঘটেছিল। তখন আবার নূতন ক'রে জপে বসি। কেন এমন হয়?

মহর্ষি বল্‌লেন: ঘুমের মত একটা ভাব? হাঁ, এমনিই ত হয়। এই ত সত্যিকারের স্বাভাবিক অবস্থা। অহংকার আছে বলেই এই স্বাভাবিক অবস্থাটিকে তোমার কাজের বিঘ্নকর বলে মনে হয়। এমনি করে অভিজ্ঞতা যত পাকা হতে থাকবে ততই বুঝতে পারবে যে এইটাই হ'ল তোমার স্বাভাবিক স্থিতি। তখন তুমি দেখবে যে, জপ হ'ল বাইরের বস্তু এবং জপ তখন আপনিই চল্‌তে থাকবে। তোমার যে

বর্ত্তমান দ্বিধা, এর মূলে আছে এই ভ্রান্ত ধারণা যে স্বরূপত তোমার আত্মবস্তু, এবং যে মন জপ করে—তারা এক এবং অভিন্ন। সমস্ত চিন্তাকে বাদ দিয়ে একটি মাত্র চিন্তায় যুক্ত হ'য়ে থাকার নাম জপ। জপের উদ্দেশ্যই হ'ল তাই। এই থেকে ধ্যান এবং এরই পরিসমাপ্তি হয় আত্মোপলব্ধি অথবা জ্ঞানে।

প্রশ্ন হল: মানুষের কর্তব্য, দায়িত্ব—এ গুলির কি কোন অর্থ নেই?

উত্তর দিলেন মহর্ষি: গাড়ীতে যখন ওঠো, তখনও কি তোমার নিজের বোঝাটি মাথায় করে বইতে থাকো? ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু যিনি, সকলের সব বোঝা তিনিই বহন করেন। তোমার বোঝা যে তুমিই বইছো, এ তোমার মিথ্যা কল্পনা মাত্র। তোমার সব ভার তুমি তাঁর হাতে নিশ্চিন্ত হয়ে সমর্পণ কর্‌তে পারো। তোমার যা কিছু করণীয়, সবই যথা সময়ে তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হবে। এ কথা ভেবো না যে তোমার ইচ্ছা না হ'লে তোমার দ্বারা নির্দিষ্ট কাজটি হবে না। তোমার ইচ্ছা হ'লেই কি তোমার সামর্থ্য হবে? সব শক্তি ঈশ্বরের।

মহর্ষির ব্যক্তিগত প্রসংগে একজন কৌতূহলী হ'য়ে জান্‌তে চাইলেন জীবন্মুক্ত মহর্ষির নিজের জীবনে মুক্তির উপলব্ধি এলো কোন্ পথ দিয়ে। উত্তরে মহর্ষি বল্‌লেন: আমার জীবনে নূতন কিছু ঘটেছে বলে আমি জানি না। চিরদিন

যা ছিলাম আমি ঠিক তাই আছি। বন্ধন ও মুক্তি—এ দু'টিই হ'ল আপেক্ষিক সত্য, অতএব মিথ্যারই নামান্তর। 'আমি বদ্ধজীব'—এই চিন্তা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই আছে মুক্তির চিন্তা। 'কে আমি বদ্ধ হয়ে আছি?'—এই আত্মানুসন্ধানের ফলে যখন চিরমুক্ত আসল সত্বাটি কালাতীত, মরণাতীত রূপে প্রতিভাত হয়, তখন আর বন্ধনের চিন্তার অস্তিত্ব থাকে কেমন ক'রে? আর যদি বন্ধনের চিন্তারই অস্তিত্ব মুছে যায় তাহলে আবার মুক্তির চিন্তা আসে কি ক'রে?

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষির এই বক্তব্যটি আরও সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। নিজের উপলব্ধির সত্যে তিনি কেন সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে মহামুক্তির পথে টেনে নিয়ে যান না—এই ছিল প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসার বিষয়।

এর উত্তরে মহর্ষি বল্‌লেন—"ঘুমন্ত অবস্থায় একটি লোক স্বপ্ন দেখ্‌লো যে এক ঘর লোক ঘুমিয়ে আছে। ঘুম ভাংগার পরে উঠে এই লোকটি কি জিজ্ঞাসা করে—'সেই যে ঘুমন্ত লোকগুলিকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, তারা কি জেগে উঠেছে?' ঠিক এমনি করেই—পৃথিবীর লোকদের নিয়ে মুক্ত পুরুষের কোন কারবার নেই। তবু যদি কেউ বলে, বদ্ধজীবের জগতে ব্যক্তিগত মুক্তিলাভে স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় তবে

তার উত্তরে, উপরোক্ত উপমাটির পুনরাবৃত্তি করে, আমি বলবো—"যে লোকটি স্বপ্নে দেখ্‌লো একঘর ঘুমন্ত লোক, সে কি স্বপ্নের মধ্যেই বল্‌বে—"সব ঘুমন্তরা না জাগলে আমি জাগবো না!"

দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে সত্য কোন্‌টি—এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলেছেন ঃ যাকে আমরা সচরাচর নিয়তি বলি তার গোড়ার দিকে আছে একটি মূল কারণ বা প্রাথমিক একটি কর্ম। স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার না কর্‌লে এই কর্মের অর্থ হয় না। অতএব প্রথম কারণ রূপে স্বাধীন ইচ্ছাটিকে বিশেষ ভাবে স্বীকার করতেই হয় এবং স্বাধীন ইচ্ছার প্রবল প্রয়োগে নিয়তিকে জয় করাও নিশ্চয়ই যায়। এই স্বাধীন ইচ্ছাকে বলিষ্ঠ ক'রে তুলতে হ'লে চাই আত্মজিজ্ঞাসা অথবা অদ্বিতীয় সত্তারূপ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। সাধারণত যাকে আমরা আত্মনির্ভরতা ব'লে ভুল করি সেটা আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তাতে বন্ধনের দশা আরও জটিল হ'য়ে ওঠে। আসল আত্ম-নির্ভরতা হ'ল ঈশ্বর-নির্ভরতা, কারণ তিনিই হলেন প্রকৃত আত্মবস্তু।

আত্মসমর্পণ যার হ'য়ে গেছে তার মনে আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে না। অহংকারের বিনাশ হ'য়ে দৈব-পুরুষকারের সমস্যারও পরিসমাপ্তি হ'য়ে যায়। নিম্নতর মনে যে চিন্তা দোলা দেয়, মহামনের মহাকাশে সেই চিন্তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় মিলিয়ে।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গুরুর প্রয়োজন কতখানি—এই প্রশ্নটির উত্তরে মহর্ষি যে কথাগুলি বলেছেন তার মধ্যে ভাববার কথা যথেষ্ট আছে। গুরুকে দেহধারী আর একজন মানুষ বলে দেখ্‌লে গুরুকরণের কোন সার্থকতা থাকে না। কারণ বাইরের কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মহর্ষি, প্রথমত, স্বীকারই করেন না। দ্বিতীয়ত, গুরু যদি অন্তরের অন্তরতম হ'য়ে প্রকটিত না হ'ন তবে তিনি অন্তরকে আত্মসত্বায় প্রতিষ্ঠিত কর্‌বেন কি করে? এ ছাড়া মহর্ষি বলেন : পৃথিবীতে এমন কি আছে যা আত্মসত্বার অজানা বা যা আত্মসত্বাকে নতুন করে শিখতে হবে! যা কিছু জানবার তা জানাই আছে; যা কিছু পাবার, সব পাওয়াই আছে; যা কিছু হবার সব হওয়াই আছে। নিজের সাম্রাজ্য বুঝে নেওয়ার যা অপেক্ষা। আর কিছু নয় কেবল চোখদুটি খুলে দেখা।

তবে, যদি কেউ নিজেকে লঘু ভাব্‌তে ভাব্‌তে লঘু ভাবাক্রান্ত হ'য়ে গিয়ে থাকে, তার পক্ষে গুরুর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। লঘু বস্তু মাত্রেই প্রবহমান, তা পরিবর্ত্তনশীল স্রোতে ভেসে যায়। মানুষ যখন শাশ্বত আত্মবস্তুর সন্ধান না পেয়ে নিজেকে বস্তু ও ব্যক্তির ভীড়ে হারিয়ে বসে থাকে তখনই তার প্রয়োজন হয় গুরুতর এমন একটি বস্তুর যা তাকে নিজের প্রবল আকর্ষণে লঘুত্বের ভ্রান্তি থেকে টেনে তুলতে পারে। পরিশেষে দেখা যায় গুরুও নেই শিষ্যও নেই! অন্তর ও

বাহিরের দ্বন্দ্ব যখন শেষ হয় তখন অন্তর বাহিরে একাকার হ'য়ে বিরাজ করেন আত্মসত্বা।

লোকে মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করে—মনকে বশে আন্‌বার পন্থা কি ? মহর্ষি বলেন—"কৈ দেখাও দেখি তোমার মন !" উত্তর হয়—"মনকে আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সে ত একটা বস্তু নয় যে বার করে দেখানো যাবে।" মহর্ষি বলেন "এই ত ভুল বল্‌লে। মনকে তুমিও দেখতে পাচ্ছ না। যা দেখছো তা চিন্তার স্রোত। ভাবছো, এই চিন্তার স্রোতই তোমার মন। চিন্তাকে আর একটু নিবিষ্ট ভাবে পরীক্ষা করে দেখলে বুঝতে পারবে যে সে তোমার মন নয়, মনের বুকে ভেসে-ওঠা কতকগুলি ব্যক্তি ও বস্তুর ছায়া মাত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা আবার জিজ্ঞাসা করে—"তাই না হয় হল ! কিন্তু মন যে চঞ্চল তা ত নিশ্চিত, এবং এই চঞ্চল মনকে সংযত করার যে প্রয়োজন আছে তাও ত নিশ্চিত। এবারে বলুন, এর পন্থা কি ?"

উত্তরে মহর্ষি বলেন "এই যে বল্‌লে চঞ্চল মনকে সংযত করার কথা এও ত তোমার মনের আর একটি চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে মন চিন্তা কর্‌তে ইচ্ছা করে, চঞ্চল হ'তে ইচ্ছা করে, সেই মনই যখন আবার খেয়ালের বশে স্থির হবার ইচ্ছা করে তবে তার সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করা যায় কি করে ? অতএব, মনের দ্বারা মনের অবসান ঘটানো যায় না। মনের

উৎস মুখে অধিষ্ঠান করে কে চিন্তা করছে, কে আবার চিন্তাকে নিরুদ্ধ করবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে তারই অনুসন্ধান করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ আমার জানা নেই।”

ঈশ্বরের নাম জপে কি হয়—এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলেন: “তুমি দেহ নও, তোমার দেহও তোমার আত্মসত্বা নয়। তবু তোমার একটা নাম আছে। এই নাম নিয়ে তুমি জন্মাও নি, এ কথাও যেমন ঠিক, তেমনি আবার এ কথাও সত্য যে তোমার নাম ধরে কেউ ডাকলে তুমি স্বভাবতই সাড়া দাও। তেমনি ঈশ্বরের নাম ধরে ডাকলে তিনিও সাড়া দেন।”

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তর-মালা থেকে মহর্ষি রমণের বিশিষ্ট মতবাদের ও জীবন দর্শনের একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। কথাগুলি হয়তো একেবারে নূতন নয়, কিন্তু প্রকাশ-ভংগীটি মৌলিক এবং একান্তভাবে মহর্ষির নিজস্ব। বইয়ের কথা এগুলি নয়, পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাও এর মধ্যে নেই। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বিধাহীন নিশ্চয়তায় মহর্ষির প্রত্যেকটি উক্তি হ'য়ে উঠেছে প্রাণস্পর্শী।

এই ধরণের মীমাংসা ছাড়াও, মাঝে মাঝে কচিৎ আলোচনা প্রসংগে, মহর্ষির কথাবার্ত্তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবসিদ্ধ মৌনতার নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে যে দু একটি ক্ষেত্রে মহর্ষি বিচার বিতর্কে যোগ দিয়েছেন, তারই দৃষ্টান্ত হিসাবে পরবর্ত্তী বিবরণটি কৌতুহলোদ্দীপক, সন্দেহ নেই।

জনৈক পাশ্চাত্য ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি বল্‌লেন : অজ্ঞানী মনে করে যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত আগাগোড়া সত্য। ইন্দ্রিয়গুলি যে প্রমাণ তার সমক্ষে উপস্থাপিত ক'রে তাকে সে অস্বীকার করতে পারে না।

ভক্তটি উত্তর দিলেন : যাকে দেখি যাকে জানি, তাকে না মানাই বা যায় কি করে ?

মহর্ষি বল্‌লেন : দেখার কথা বল্‌ছো, জানার কথা বল্‌ছো ! কিন্তু নিজেকে যতক্ষণ না জানো, ততক্ষণ কার দেখার, কার জানার কথা তুমি বলছো ? যে দেখে, যে জানে তাকে বাদ দিয়ে সেই দেখা বা জানার আসল স্বরূপ তোমার কাছে ধরা পড়তেই পারে না। স্বীকার করি যে তোমার দেহ ও ইন্দ্রিয় বস্তুজগতের সংস্পর্শ লাভ করে। কিন্তু মানার প্রশ্ন, সত্য বলে স্বীকার করার প্রশ্ন যখন ওঠে তখন কি তোমার দেহ করে সেই প্রশ্ন ? দেহ কি বলে, "বস্তুর বোধ পেয়েছি, এ বস্তু কি সত্য ? অথবা জগৎ কি তোমাকে ডাক দিয়ে বলে, "আমি জগৎ, আমি সত্য !"

ভক্ত : আপনি বল্‌বেন জগৎ স্বপ্নের মত অলীক। জাগ্রত অবস্থায় যে জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ পাচ্ছি তাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিই কেমন করে ? স্বপ্ন হ'লে, এখনকার দৃশ্য পরক্ষণে দেখতে পেতাম না ; একজনের অভিজ্ঞতার সংগে আর একজনের অভিজ্ঞতা মিলে যেতো না। স্বপ্ন হ'লে অসংগতি থাকতো।

মহর্ষিঃ এখন জেগে আছো বলেই তোমার মনে হচ্ছে স্বপ্নের অসংগতির কথা। যখন স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে তখন স্বপ্ন-জগতের সমস্ত চাই মনে হয়েছিল সুসংগত। স্বপ্নের মাঝেই হ'লে তৃষ্ণার্ত, স্বপ্নের মাঝেই পান করলে জল এবং স্বপ্নের মাঝেই মিট্‌লো তোমার তৃষ্ণা। যতক্ষণ স্বপ্ন ছিলো ততক্ষণ এ সবই মনে হয়েছে যথার্থ। জেগে উঠে তবে বুঝতে পারছো যে তখন যা দেখেছিলে, যা বোধ করেছিলে, যা হয়েছিলে সে সবই ছিলো মিথ্যা স্বপ্নের ব্যাপার। ঠিক তেমনি করে, জাগ্রত অবস্থায় যতক্ষণ রয়েছ তার মধ্যেও কোন অসংগতি তুমি বুঝ্‌তে পারছো না। তাই তোমার ধারণা হচ্ছে যে জগত সত্য। কিন্তু জগত যদি স্বতঃসিদ্ধ সত্য হ'ত তা হলে স্বপ্নের মধ্যেই বা তার প্রমাণ পাওয়া যাবে না কেন? তোমার অস্তিত্ব যে নিদ্রিত অবস্থাতেও ছিল এ ত তুমি অস্বীকার করতে পার না!

ভক্তঃ আমার নিদ্রাকালে জগত ছিল না তাও ত আমি বলি না। জগত বরাবরই ছিলো। যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম আমার দেখায় ছেদ পড়েছিল কিন্তু যারা তখন জেগেছিল তারা দেখেছে।

মহর্ষিঃ তোমার নিদ্রিত অবস্থায় জগত ছিলো প্রমাণ করতে হ'লে তোমাকে নিতে হয় অন্য লোকের সাক্ষ্য কিন্তু নিদ্রাকালে তোমার নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারটা ত কই সাক্ষ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তা ছাড়া, ভুলে যাচ্ছো কেন যে

অপরের দেওয়া এই সাক্ষ্য তুমি গ্রহণ করছো জেগে উঠে। তোমার নিজের বেলায় ব্যাপারটা হচ্ছে অন্যরূপ। ঘুম থেকে উঠেও তুমি বেশ বল্‌তে পারো তোমার ঘুম কেমন হয়েছিল। ঘুমন্ত অবস্থাতেও তুমি যে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলে এই ঘটনাতেই তার প্রমাণ বিদ্যমান। অথচ নিদ্রাকালে জগৎ সম্বন্ধে তোমার কোন চেতনাই ছিল না। এখনও, তোমার সজাগ অবস্থাতেও জগৎ যে সত্য, সে কথা জগৎ বল্‌ছে না—বল্‌ছো তুমিই।

ভক্ত : আমি বল্‌ছি—তা ঠিক, কিন্তু জগতের সম্বন্ধেই ত আমি এ কথা বল্‌ছি।

মহর্ষি : বেশ তাই যদি হয়, তবে ত এই কথাটাই দাঁড়ায় যে তুমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও, জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছো। এটা কি জগতের তরফ থেকে একটা হাসির ব্যাপার নয়? যেমন ক'রে হোক তুমি প্রমাণ করতে চাও যে জগত সত্য। সত্যের মানদণ্ড কি? সত্য একমাত্র সেই বস্তু যার অস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ—যা স্ব-প্রকাশ যা অনন্ত যা অপরিবর্ত্তনশীল।

জগৎ কি স্বয়ংসিদ্ধ? মনের সাহায্য ছাড়া একে কি দেখা যায়? সুষুপ্তির কালে মনও থাকে না, জগৎও থাকে না। জেগে উঠ্‌লো মনও আসে, জগতও আসে। এই ঘটনা পারম্পর্যের অর্থ কি?

ভক্ত : আপনিই বলুন এর অর্থ ?

মহর্ষি : নিদ্রাকালে যেমন স্বপ্নজগৎ তোমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়, জাগ্রত অবস্থায় তেমনি সত্য বলে প্রতিভাত হয় এই জগৎ। নিদ্রিত অবস্থায় মন ও অহংকারের সংগে একযোগে এই দৃশ্যজগৎ ও আত্মসত্বায় বিলীন হ'য়ে বীজাকারে অবস্থান করে। জেগে ওঠার সংগে সংগে আত্মসত্বা আড়ালে সরে গিয়ে অহংকার দেহরূপ ধারণ করে, আর জগতকে দেখে মোহিত হয়। সুষুপ্তি ও জাগ্রত অবস্থায় সমভাবে জগৎকে প্রত্যক্ষ করে এমন ত কারুকে দেখি না। যদি তেমন কেউ থাকে—সে কি দেহ ?

ভক্ত : অসম্ভব !

মহর্ষি : তবে সে কি মন ?

ভক্ত : নিশ্চয়ই তাই।

মহর্ষি : তাই বা কি করে হয় ? সুষুপ্তি কালে তোমার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তখন তোমার মন ত নেই।

ভক্ত : বুঝতে পারছি না তবে হয়তো সুষুপ্তিকালে আমার অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যায়।

মহর্ষি : তাই যদি হ'ত—তা হ'লে গত কালের কোন অভিজ্ঞতা আজ তুমি স্মরণে আন্‌তে কি করে ? তবে কি তুমি সত্যি বল্‌তে চাও যে তোমার আত্মসত্বার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে আসছে ?

ভক্ত : অসম্ভব কি ?

মহর্ষি : তা হলে ত জন্‌সন্ ঘুমিয়ে জেগে উঠ্‌তো বেন্‌সন্ হয়ে! কিন্তু তা ত হয় না। ঘুম থেকে উঠেও তোমার ঘুমের আগেকার পরিচয়টি অবিকৃত থাকে কি করে? তুমি বলো 'আমি ঘুমিয়েছিলাম'—'আমি জেগেছি' অর্থাৎ তুমি হচ্ছো সেই একই ব্যক্তি যে ঘুমের মধ্যে এবং জাগার মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় রূপে বিরাজ কর্‌ছে। ঘুম থেকে উঠে তুমি যখন বলো—'আরামে ঘুমিয়েছিলাম'—তখন তার একটিমাত্র অর্থ ই হয় যে, ঘুমের সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছিলো। সেই সুখকর অভিজ্ঞতা যার স্মরণে আছে সে নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতার মালিক যে—তার সংগে এক এবং অভিন্ন। এইবার তুমি কি বল্‌বে?

ভক্ত : কি বল্‌বো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

মহর্ষি : যদি ঘুমের মধ্যেও জগতের অস্তিত্ব ছিলো, এমন হয়—তা হলে জিজ্ঞাসা কর্‌বো জগৎ কি তোমাকে সে কথা তখন বলেছিলো?

ভক্ত : না, তা বলেনি। কিন্তু জগৎ ত সে কথা আমাকে এখন বল্‌ছে। চল্‌তে চল্‌তে পায়ে যখনি পাথর ঠুকে যায় তখনই ত প্রমাণিত হয় যে জগতের অস্তিত্ব কাল্পনিক নয়। আঘাতেই পাই পাথরের প্রমাণ—সংগে সংগে পাই জগতের প্রমাণ কারণ পাথর ত আর জগৎ-ছাড়া নয়।

মহর্ষি : পাথর যে আছে সে কথা কি পা বলে দেয়?

ভক্ত : পা বলে না। এ কথা বলি আমি।

মহর্ষি : কে এই আমি ? এ নিশ্চয়ই শরীর নয়, মনও এ হ'তে পারে না। এ হ'ল সেই সাক্ষী—জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির মধ্যে যে সমভাবে বিদ্যমান আছে। সেই 'আমি', যে সর্ব অবস্থায় থাকে অপরিবর্তিত। অবস্থা তিনটি আসে আর যায়, কিন্তু এদের মাঝখানে অচল অটল হ'য়ে থাকে এই 'আমি'। এই 'আমি' বা আত্মসত্বাকে উপলব্ধি কর্‌লে সমস্ত অসন্তোষের হয় নির্বাণ এবং পরিপূর্ণ আনন্দ হয় করতলগত।

ভক্ত : কেউ যদি এই অবস্থায় উপনীত হ'য়ে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করে এবং তার পরে জগতকে এই লাভের অংশ দিতে না চায় তা হ'লে কি সেটা স্বার্থপরতা হয় না ?

মহর্ষি : এই অবস্থার কথা শুনে তুমিও ত এই অবস্থা নিজেই লাভ কর্‌তে পার। তখন তুমিও উপলব্ধি করবে যে আত্মসত্বার বাইরে কোনরূপ বস্তুজগতের অস্তিত্ব নেই। এই উপলব্ধির সংগে সংগে তোমারও জ্ঞান হবে যে তোমার ব্যবহৃত এই স্বার্থপরতা কথাটির কোন অর্থ নেই কারণ তখন তুমি দেখবে যে জগত আত্মসত্বায় বিলীন হ'য়ে গেছে।

ভক্ত : কিন্তু যিনি ঋষি তিনিও ত জানেন যে পৃথিবীতে যুদ্ধ আছে, ব্যথা বেদনা আছে। এ জেনেও তিনি আনন্দে থাকেন কি করে ?

মহর্ষি: ছায়াচিত্রের পর্দার উপরে কত বন্যার, কত অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য প্রতিফলিত হয়। তাতে কি পর্দার কোন ক্ষতি হয়? আত্মসত্বা হ'ল ঠিক এমন একটি পর্দা! জাগতিক ঘটনায় সে বিচলিত হয় না। দুঃখ ততক্ষণই সম্ভব যতক্ষণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পার্থক্য আছে। অহংকার-মুক্ত অবস্থায় এই পার্থক্যের বোধ থাকে না। এ অবস্থায় আত্মসত্বা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। ঋষি-জনোচিত এই অবস্থাটি কেবল আত্মসত্বারই অবস্থা।

এই কথাবার্তা এইখানেই শেষ। অনুমান করে নিতে বাধা নেই যে মহর্ষির শেষ উক্তির উত্তরে বলার মত কিছু না পেয়ে ভক্তটি নিরুত্তর হ'য়ে ছিলেন। হয়তো বা বুদ্ধির রাজ্যের শেষ সীমান্তে পৌঁছে বোঝবার চেষ্টায় ক্ষান্ত দেওয়া ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না বলেই এই আলোচনা এর পরে আর স্বভাবতই অগ্রসর হয় নি। কিন্তু তবু এরই মধ্যে যতটুকু আমরা পেয়েছি তাতেই মহর্ষির বিশেষ বক্তব্য ও দৃষ্টিভংগীর পরিচয়টি হ'য়ে আছে সুস্পষ্ট। আমরা, যারা মহর্ষির এই পাশ্চাত্য ভক্তের মত, বুদ্ধি নিয়েই কারবার করি এবং বস্তুনিরপেক্ষ, ব্যক্তিনিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ সত্য আত্মবস্তুর গভীরতম রহস্যে যাদের অনধিকার—এর পরে আমাদেরও আর বলার কিছু থাকে না।

অতএব মহর্ষি বর্ণিত আত্মোপলব্ধির মহাবাক্য, অর্থহীন ও অক্ষম টীকাভাষ্যে কণ্টকিত না করে, সময়ান্তরে কথিত

মহর্ষির নিজের উক্তি আরও একটু উদ্ধৃত করে, এই প্রসংগের শেষ করি।

"এক এবং অদ্বিতীয় যে সত্তা তার অংশও নেই, সীমাও নেই। আংশিক সত্তায় সৃষ্টিরূপে যা কিছু প্রতীয়মান হয় তা নিছক মনেরই কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। অখণ্ড অরূপকে মোহের দ্বারা খণ্ডিত করে মন বহুত্বের বিভাগ সৃষ্টি করে। অথচ সত্তাকে বাদ দিয়ে মনেরও কোন অস্তিত্ব নেই। সোনার একটি অলংকার ঠিক যে সোনা তা নয়—কারণ বিশেষ একটা উপাধি ও বিশেষ একটা রূপ পরিগ্রহ করে সেটি যেন স্বতন্ত্র আর একটি বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তবু বিচার করলেই বোঝা যায় যে আসলে এই স্বাতন্ত্র্য-মোহিত বস্তুটি সোনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মন হ'ল আত্মসত্তারই এমনি একটি রহস্যময় শক্তি যার প্রভাবে এক সত্তা বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মনের বিকাশের সংগে সংগে ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ-রূপী ত্রয়ীর ঘটে আবির্ভাব। সুষুপ্তির মাঝে এই তিনটি বিভিন্ন বস্তু মিলে একাকার হ'য়ে যায়।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে মহর্ষি রমণের সাধনা ও সিদ্ধির যে পরিচয়টি পাওয়া যাবে সেটি প্রধানতঃ তাঁর মতবাদের দিক। সংগে সংগে মনে রাখতে হবে যে মহর্ষি দার্শনিক নন এবং কোনরকম মতবাদের গণ্ডী দিয়ে তাঁর

উপলব্ধির পরম সত্যকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের ধরণ ধারণ লক্ষ্য করে দেখ্‌লে এ কথা একবারও মনে হয় না যে কারুর প্রতি বা কিছুর প্রতি তাঁর কিছুমাত্র টান আছে। অবশ্য টান যে নেই—সে কথাও মনে হবার বিশেষ কোন কারণ ঘটে না, তা ঠিক। কিছুতেই তিনি লিপ্ত নন, এ কথা যেমন ঠিক, কিছুর প্রতি তিনি বিরূপ নন, এ কথাও ঠিক তেমনিতরই সত্য। গুরুগিরি তিনি করেন না। যাকে তিনি নিজের জীবনে সত্য বলে জেনেছেন, সেই তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির সত্যটিকে সবাইকে দিয়েই মানিয়ে নিতে হবে—এমন কোন প্রচেষ্টাও তাঁর নেই। প্রশ্ন কর্‌লে কখনো উত্তর দেন কখনো বা তাও দেন না। বিশেষ ভাবে কোন আগন্তুক বা স্থানীয় ভক্তের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনরূপ প্রীতি বা আকর্ষণের নিদর্শনও বড় একটা পাওয়া যায় না। অলৌকিক বল্‌তে সাচরাচর আমরা যা বুঝি তেমনতর ঘটনা রমণা-শ্রমের আশেপাশে নিয়ত ঘটেছে বলেও শোনা যায় না। তবে মহর্ষির কাছে পৃথিবীর দেশ দেশান্তর থেকে এত লোক কিসের প্রয়োজনে ছুটে আসে? কি তারা চায়, কি-ই বা তারা পায়?

মহর্ষির ভক্ত মেজর স্যাড্‌উইক্‌কে ঠিক এই প্রশ্নটিই করেছিলেন জনৈক অষ্ট্রেলিয়াবাসী সাংবাদিক। প্রসংগ ক্রমে



অরুণাচলের পার্বত্য-পথে মহর্ষি



"মূর্ত্তিমন্ত শিব এই অরুণাচল পর্ব্বত"—মহর্ষি রমণ



বর্ত্তমান রমণাশ্রম

এখানে বলে রাখা উচিত যে মেজর স্যাড্উইক্ মহর্ষির দুর্বোধ্য আকর্ষণে জড়িয়ে গিয়ে পূর্বাশ্রমের নাম এবং পরিচয় ত্যাগ করে 'সাধু অরুণাচল' বলেই এখন পরিচিত। রমণাশ্রমে এসে সাংবাদিক সাহেবটি, যথারীতি যা কিছু দর্শনীয় সব চট্‌পট্ দেখে নিয়ে, মেজর স্যাড্উইকের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। মেজরকে একান্তে পেয়ে তিনি বল্লেন—"আমার নাম শুনে থাক্‌বেন। আশ্রম দেখ্‌তে এসেছিলাম। দেখ্‌লাম মহর্ষিকে, দেখ্‌লাম দ্রষ্টব্য যা কিছু এখানে আছে। যেমন যেমনটি ভেবেছিলাম সবই ঠিক ঠিক মিলে গেছে। কিন্তু সমস্যায় পড়েছি আপনাকে নিয়ে। আপনি এখানে করেন কি? কিসের জন্যই বা এখানে পড়ে আছেন? এই ঘর, এই বিছানা, এই সস্তা নোংরা আসবাব পত্র—এর মাঝখানে আপনার দরের একজনকে স্বেচ্ছায় বন্দী হ'য়ে থাক্‌তে দেখ্‌বো—এ আমি স্বপ্নেও মনে কর্‌তে পারি না। মহর্ষিকে এরা সাধু মনে করে—বেশ কথা। ইণ্ডিয়ায় এমনিতর আশ্রম অনেক আছে, তাও জানি। কিন্তু আপনার সংগে এখানকার সম্বন্ধ কি?"

মেজর স্যাড্উইক্‌কে চুপ করে থাক্‌কে দেখে, সাংবাদিক-প্রবর আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"রহস্যটা একটু পরিষ্কার করে দিলে দোষ কি? আপনি সভ্য য়ুরোপের একজন

বিশিষ্ট প্রতিনিধি বলেই আমি জান্‌তে চাইছি—এদের ব্যাপার কিছু লিখ্‌ছেন বুঝি ?

উত্তরে মেজর বল্‌লেন—"এখানে থাকি ভালো লাগে বলে, তাই। লেখা পড়া কিছুই আমি এখানে করি না।"

অনেকক্ষণ ধরে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অষ্ট্রেলিয়াবাসী সাংবাদিক, বোধ করি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েই, একান্ত নিরাশায় মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ—'বুঝেছি ; আর বলতে হবে না। মাথাটি বেচারার একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই !'

উপরোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করে মেজর স্যাড্‌উইক্ লিখেছেন : "সাংবাদিকের প্রশ্নের আশানুরূপ কোন উত্তর আমি দিতে পারি নি। বল্‌বার মত আমার ছিলই বা কি ? সত্যি কথা বল্‌লে তাকে কোন মতেই বিশ্বাস করান যেত না। বল্‌লাম, ভালো লাগে, এখানে আমি মনে শান্তি পাই। পূরোপুরি উত্তর এতে হয় না তাও আমি জানি। আমার কথা শুনে আমার দিকে একান্ত করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে অনুকম্পার স্বরে সে বল্‌লো—'শান্তি পাও ? তা ভাল। তবে কিনা, আমি কখনো এ ধরণের দুশ্চিন্তায় পীড়িত হই নি !' বুঝ্‌লাম তার ধারণা হ'ল যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

এই প্রসংগে মেজর স্যাড্‌উইক্ আরও লিখেছেন : "আমি তাকে একটু দোষ দিই না। আমাকে পাগল মনে করলে সেই

ধারণা ভুল বলি কেমন করে? পুরো আধখানা জীবন আমি কাটিয়ে দিলাম এমন একটি বস্তুর অনুসন্ধানে যা আমার আছে। সে বস্তুটি যে আছে তা আমি মনে প্রাণে জানি। মুস্কিল হয়েছে এইখানেই। বলার মত কিছুই আমার নেই। কিন্তু তবু যদি প্রশ্ন ওঠে আমি এখানে পড়ে আছি কেন, তার উত্তরে আমি বল্‌তে বাধ্য হবো যে ভগবান রমণকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না। চুম্বক যেমন করে লোহাকে টেনে রাখে, ঠিক তেমনি করেই আমি বাঁধা পড়ে আছি। চলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই।"

"একথা সত্য যে অধিকাংশ লোকই ভগবানের কাছে আসে পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক কোন না কোন সম্পদের কামনা নিয়ে। লোকের মুখে শুনি কত রকমের অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা। তাদের একটিকেও আমি অসম্ভব বলে মনে করি না।.... বড় ঘরের একপ্রান্তে আমি তাঁকে উপবিষ্ট দেখি। দেখি তিনি পরিপূর্ণভাবে নির্লিপ্ত। আমাদের কাছে যে সব ঘটনাগুলি বৃহৎ বলে প্রতীয়মান হয়, দেখি সেগুলি যেন তাঁকে একেবারেই স্পর্শ করে না। আমি দেখি তাঁর মুখের অনুপম সুন্দর হাসিটির কোন তুলনা নেই। এমন একটি পরম সৌম্য প্রশান্তি—যার বর্ণনা হয় না, স্বচক্ষে না দেখ্‌লে যা বিশ্বাস করাও যায় না। এতেই আমার মনে আসে অনন্ত আশা, অপরিসীম উৎসাহের উদ্দীপনা। অতীতের কত মহাপুরুষের কথাই ত পড়েছি। কিন্তু

তাদের প্রেরণা আমার কাছে এতখানি সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে কি করে! এখানকার যে বস্তুটি, সেটি এমন একটি অভ্রান্ত সত্যে যে হাজার ইচ্ছা করলেও একে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখা যায় না। আমার বিশ্বাস—এই জন্যই এখানে লোক আসে আর রয়ে যায়। এই পরিবর্ত্তনশীল ও অনিশ্চিত জগতে আমরা যেন নিশ্চয়তার ধ্রুব কেন্দ্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি।"..........

প্রসংগক্রমে আরও একজন পাশ্চাত্য ভক্তের নিজের মুখে বলা অভিজ্ঞতার বিবরণ এখানে দেওয়া যায়। অধ্যাপক ডান্‌কান্‌ গ্রীন্‌লিস্‌ নিছক কৌতুহলের বশেই মহর্ষিকে দেখ্‌তে আসেন নি। অধ্যাত্মতৃষ্ণার ব্যাকুলতায় অনেক পথ ঘুরে তিনি যখন রমণাশ্রমের সন্ধান পেয়ে মহর্ষির সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হলেন তখনকার মনোভাব তিনি এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"মহর্ষিকে দেখার সংগে সংগে আমার মনে জাগ্‌লো গভীর প্রতীতি যে এই মানুষটি জীবন সমস্যার চরম সমাধানটি খুঁজে পেয়েছেন। এমন একটি শান্তির দ্যুতি তাঁকে ঘিরে আছে যে তাঁর সান্নিধ্যে আসা মাত্রই চিত্ত হ'য়ে যায় দ্বিধাহীন। সে শান্তি যেন মধ্য রাত্রির নভতলের নিঃসংশয় প্রশান্তি! আমার মনে হ'ল, আমি যা চেয়েছিলাম তাই এখানে পেলাম! এই সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ, সেই দৈব-মানব। কেন আমার এ কথা মনে হ'ল তা আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌বো না। যে প্রশ্নগুলি

জিজ্ঞাসা করবো মনে করেছিলাম সেগুলি যে কোথায় মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল, তাদের আর খুঁজে পেলাম না। মনে হ'ল, এখানে এসে জিজ্ঞাসার আর কোথাও কিছু থাকে না।"

"এসেছিলাম মাত্র চারদিন থাকবার কড়ারে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রয়ে গেলাম। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেন অসম্ভব ব'লে মনে হতে লাগলো। ভিতরে ভিতরে আমার উদ্দাম প্রকৃতি দিনে দিনে শান্ত, পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। কোন্ গভীরের নিস্তরংগ প্রশান্তি যেন আমার অন্তরলোকে অপরূপ মহিমায় বিকসিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। আমার মনে হতে লাগলো যেন সেই অপরিবর্ত্তনীয় অনন্ত সত্বার উৎসমুখে আমি পৌঁছে গেছি।"

"বিদায়ের ম্লান ক্ষণটি যখন এলো—আমার মনে হ'ল যেন আমার দেহটি হ'য়ে উঠেছে ভারি একটা বোঝা। কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে বোধ হ'তে লাগলো যে আমার মনটা সমগ্রভাবে পিছনে ফেলে এসেছি, আর আমার দেহের অংগপ্রত্যংগগুলি আপনা আপনি যন্ত্রের মত তাদের অভ্যস্ত কাজগুলি করে যাচ্ছে। এমন আর একটি মানুষের কথা আমি জানি না যাঁর সান্নিধ্যে এসে ব্যক্তিত্বটি এ ভাবে শূন্যতার গভীরতম কেন্দ্রে গিয়ে শূন্যময় হ'য়ে যায়। মহর্ষি যে আত্ম বিচারের কথা বলেন—অনেকেই হয়তো সে পথে চলে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু আমার কথা আমি বল্‌তে পারি। আমি চেষ্টা

করেও সে পথে চল্‌তে পারি নি। কিন্তু মহর্ষির সান্নিধ্যে এসে আমি কোনরূপ পন্থারই প্রয়োজন বোধ করিনি। মহর্ষির অনুগ্রহ-রশ্মিতে স্নাত হ'য়ে আমি পেয়েছি অসীমের সাক্ষাৎ ও সুস্পষ্ট অনুভূতি। বুঝেছি যে সেই অনুগ্রহ স্বয়ং তাঁরই অনুগ্রহ।"

"আশ্রমে অবস্থান কালে দু'টি ঘটনা ঘটেছিল যা আমার মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হ'য়ে আছে। ঘটনা হিসাবে তারা এমন কিছুই নয়—কিন্তু তবু এই সামান্য দু'টি ঘটনাকে আমি কখনো ভুলতে পারবো না। প্রথম ঘটনাটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে মহর্ষি এর আগে আর কখনো স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমাকে কিছু বলেন নি। সেদিন মহর্ষির বড় ঘরটির একপাশে, একখানি যোগের বই হাতে নিয়ে অলস ভাবে পাতা উল্‌টে যাচ্ছিলাম। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে হয়তো বা একটু তন্দ্রার মত আস্‌ছিল। সহসা আমাকেই উদ্দেশ করে মহর্ষি ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন-"ওটা কি বই?" আমি বল্‌লাম। মহর্ষি বল্‌লেন—"মিলারেপা পড়ো!" তখনই উঠে পড়লাম। আশ্রমের গ্রন্থাগারে খোঁজ করে, তিব্বতীয় মহাযোগী মিলারেপার জীবনীখানি সংগ্রহ করে তখুনি পড়তে সুরু করে দিলাম। মনে হ'ল যেন আমার অন্তর কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে অনুভূতির গভীরতায়। আমার বিশ্বাস ভগবান রমণ জেনেশুনেই আমাকে এই অপূর্ব বইখানি পড়তে বলেছিলেন।"

"এইবার দ্বিতীয় ঘটনাটি বল্‌বো। আশ্রমে অবস্থান কালে উত্তর ভারতের জনৈক উকিল ভদ্রলোকের সংগে আমার আলাপ হয়েছিলো। তিনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। ভাবা-বেগের প্রেরণায় তিনি তৃষ্ণার জল খুঁজতে খুঁজতে রমণাশ্রমে এসে পৌঁছেছিলেন। রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের তলে আমার পাশা-পাশি শুয়ে তিনি আমাকে তাঁর অতৃপ্ত আকাংখার কথা প্রত্যহই শোনাতেন। তাঁর মনে শান্তি ছিল না। যে পক্ষকাল তিনি অশ্রমে ছিলেন তার প্রত্যেক দিনটি তাঁর কাছে অসহনীয় বলে মনে হ'তো। তিনি বল্‌তেন—'এখানে আমার অন্তরের তৃষ্ণা মিটবে কিসে? রাধাকৃষ্ণের প্রেমমধুর লীলাপ্রসংগে যে রস, মীরার বিরহ-বেদনায় যে মাধুরী—এখানকার এই অদ্বৈত ভাবে তার মূল পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। আমি কালই চলে যাবো। এখানকার এই বেদীতে উপবিষ্ট প্রাণহীন মর্মরমূর্তির মধ্যে সেই প্রেম-নির্ঝরিণী কোথায় পাবো?"

"কিন্তু রাত্রের প্রতিজ্ঞা প্রভাতে পূর্ণ হত না। দিনের পর দিন একই ভাবে কাট্‌তে লাগলো। তাঁর মনের অশান্তি রয়েই গেল। প্রায় এক পক্ষকাল আশা-নিরাশায় যখন কেটে গেল তখন তিনি বল্‌লেন—'আর না! এখানে আমার প্রাপ্য কিছু থাকলে এতদিনে পেতাম। কালই আমি সোজা বৃন্দাবনে চলে যাবো—গিরিধারী গোপালের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে দেবো!"

"তাঁর বিদায়ের দিনটির কথা আমি ভুলতে পারি না। বিদায়ের আয়োজন সেরে, বন্ধু কতকগুলি ফল মহর্ষির চরণে দেবার জন্য নিয়ে এসেছেন। মহর্ষি মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। বন্ধুটি ফলের বোঝা হাতে নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। মহর্ষি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বন্ধুর মুখেও কথা নেই। সহসা বন্ধুটির মধ্যে কি যেন একটা ঘটে গেল। মহর্ষির পায়ে মাথা গুঁজে তিনি অকস্মাৎ ভূমিতলে গড়িয়ে পড়লেন। তাঁর দুটি চোখ বেয়ে বাঁধনহারা অশ্রুধারা ঝরঝর করে পড়লো ঝরে। ফলগুলি ছড়িয়ে গেল ঘরের চারিপাশে। ভগবান তখনো চিত্রার্পিতের মত স্থির হ'য়ে আছেন দাঁড়িয়ে। বন্ধুটি অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। অবশ দেহ থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। বিদায়ের কথাটি উচ্চারণ করতে পারলেন না। প্রসন্ন মৃদু হাস্যে অবর্ণনীয় কোমলতার ভংগীতে মৃদুস্বরে মহর্ষি বল্লেন—"সারি পো!" (ঠিক আছে ঃ যাও)

"দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান গাড়ীতে যখন আমি বন্ধুটিকে তুলে দিলাম তখনো তিনি ভাবের ঘোর কাটিয়ে উঠ্তে পারেন নি। আমার মনে হ'ল—তিনি মহর্ষির মধ্যে সহসা তাঁর আরাধ্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি যেন সেই মুহূর্তে আমার নিজের মধ্যেও সেই উত্তাল তরংগের একটুখানি ছোঁয়াচ পেলাম। আর সেই থেকে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি আমার চিত্তে গভীরভাবে

চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে। চোখ বুজলেই এখনো আমি আগাগোড়া সমগ্র দৃশ্যটি চোখের সামনে দেখতে পাই। মহর্ষির সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মৃদু মধুর স্মিত হাস্যরেখা মানসলোকে অপরূপ হ'য়ে ফুটে উঠে।"

আর একটি বিদেশিনী মহিলার কাহিনী এখানে না বল্‌লে অন্যায় হবে। মহিলাটির নাম শ্রীমতী এলিয়েনর পলিন্ নয়ে—আমেরিক্যান, ক্যালিফর্নিয়ার অধিবাসিনী। কোন্ নিদারুণ বেদনার সংঘাতে ইঁনি গৃহ-সংসার পরিত্যাগ করে ভবঘুরের জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন—সে কথা জান্‌বার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর নিজের মুখের উক্তি থেকে জানা যায় যে এই সংঘাতের ফলে তাঁর দেহ মন এককালে বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। মনে হয় যেন ভাংগা মনটার অপরিহার্য বাহন হিসাবে কংকালসার নির্জীব দেহটাকে দূর দূরান্তে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর এ যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য। জাহাজে উঠ্‌লেন চোরের মত, পাছে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্থান দিতে ভয় পান। কিন্তু তাঁর নিজের মনে ভয় ছিল না, ভাবনা ছিল না, অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের কোনরকম আশংকাই ছিল না। সমস্ত ছাপিয়ে কেবল এই বোধটিই ছিল যে, যেমন করে হোক, যেখানেই হোক, যতদূরেই হোক, তাঁকে যেতে হবে; এবং সেখানে, দৃষ্টিসীমার বাইরে, তাঁর জন্য যে পরিণতি অপেক্ষা করে আছে তাই তাঁকে পেতে হবে।

যাত্রাকালে, ভারতবর্ষে আসার কথা এলিয়েনর ভাবেন নি। দক্ষিণ আফ্রিকা-যাত্রী জাহাজখানিতে যখন তিনি চেপে বস্‌লেন তখনকার মনের ভাব ছিল, যেখানে হোক একটা কোথাও যাওয়া চাই। জাহাজের মধ্যে রোগশয্যায় পড়ে কেঁদে কেঁদে তাঁর সারারাত্রি কেটে যেতো। রাজ্যের যত ভয় ভাবনা, নামহীন কারণহীন, আতংক বুকের মধ্যে বোঝা হ'য়ে থাকতো চেপে। প্রার্থনা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন, প্রার্থনা আস্‌তো না। শারীরিক ও মানসিক অশান্তি যখন চরমে পৌঁছেছে তখন অকস্মাৎ এক নিশিভোরে জাহাজ এসে পৌঁছালো ডার্বান বন্দরে।

ডার্বান থেকে কেন যে তিনি সহসা আর একদিন একখানি ভারতবর্ষ গামী জাহাজে চেপে বস্‌লেন এবং কল্‌কাতার টিকেট থাকা সত্ত্বেও কেন যে বিনা কারণে মাদ্রাজে অবতরণ কর্‌লেন এই প্রশ্নের উত্তরে এলিয়েনর বলেছেন—"এ ইংগিত নিয়তির, নইলে মহর্ষির দেখা পাবো কি করে?" মাদ্রাজ থেকে কোদাই কানালের গিরিনিবাসে যেদিন পৌঁছালেন সেইদিনই পথে একজন অপরিচিত হিন্দু ভদ্রলোকের সংগে কেমন করে হ'ল আলাপ। প্রথম আলাপের ব্যবধান তখনো কাটে নি—এলিয়েনর কিছু না ভেবেই, অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে বস্‌লেন—"এদিকে কোন সাধু আছেন, আপনি জানেন?" কেন তিনি একথা জিজ্ঞাসা করলেন; যে সাধুদের সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ধারণা

কিছুই ছিল না—হঠাৎ তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর কৌতুহল এমন অসংবরণীয় ভাবে আত্মপ্রকাশ করলো কেন, এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—এ ঘটনায় তাঁর নিজের কোন হাত ছিল না; অতএব এ সমস্যার সমাধানও তাঁর কাছে নেই।

প্রথম দর্শনের এইরূপ বিবরণ এলিয়েনর নিজেই লিখেছেন: "ঘরে প্রবেশ করছি আর মনে হচ্ছে যেন আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে। চারিদিকের বাতাসে পূত প্রসন্নতার দিব্য অনুভূতি সৌরভের মত জড়িয়ে আছে। কৌপীন মাত্র পরিধানে তিনি গদীর উপরে বসে,—চারিদিকে ভক্তেরা আছে বেষ্টন করে। যখন তিনি মৃদু হাস্যে আমার পানে দৃষ্টিপাত করলেন, মনে হ'ল যেন স্বর্গের দ্বার খুলে গেল। এমনতর দিব্য জ্যোতি কারুর চোখে কখনো আমি দেখিনি। এমন কোমল কণ্ঠে তিনি আমাকে আপ্যায়িত করলেন যে এক মুহূর্তে আমার মনের সমস্ত আড়ষ্টতা ঘুচে গেল। তাঁর আয়ত ছুটি চোখে কি গভীর প্রেম, কি অতল-স্পর্শ করুণা। তিনি নিঃশব্দে মৌন হ'য়ে থাকলেও এ প্রেম, এ করুণা স্পষ্ট অনুভব করতে কোন বাধা হয় না। কি দেখবো, কিছুই আমি জানতাম না। দেখার পরে মনে হ'ল—'এ অপূর্ব! এমনটি আর হয় না।' আমার মনে হয় না যে পৃথিবীতে এমন আর একটি কোথাও বর্তমান আছে। মহর্ষিকে দেখলে

ভাল না বেসে পারা যায় না। আমার মনে হ'ল তাঁর দৃষ্টি অন্তর্যামীর মত আমার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখে নিয়েছে ;—তিনি জেনে নিয়েছেন আমার তাঁকে কতখানি প্রয়োজন। তাঁর কাছে যে আসে সেই ধন্য হ'য়ে যায়—সকলের মধ্যে সংক্রামিত হয় তাঁর শান্তিরাজ্যের প্রভাব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে এসে নতজানু হ'য়ে প্রণাম করে। তিনি মধুর হাস্যে করেন তাদের সম্বর্ধনা। কখনো বা শিশুদের দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেন। আমার চোখে জল ভ'রে আসে—মনে পড়ে যায় শিশুমণ্ডলী পরিবৃত যিশুখৃষ্টের আলেখ্য।"

"প্রথম দর্শনে মহর্ষির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আমার মনে জন্মেছিল, কয়েকটি দিনের মধ্যেই তা গভীর প্রীতিতে হ'ল পরিণত। আমার অন্তর উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌লো শান্তিসুধায় এবং সংগে সংগে আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। আগে যা কিছু আমার কাছে পরম প্রয়োজনীয় বলে বোধ হ'ত এখন যেন সেগুলির কোন মূল্যই আমার কাছে রইলো না। গতকালের যে চিন্তাগুলিতে ছিল ব্যথা, আগামী-কালের যে ভাবনাগুলিতে ছিল আশংকা—সে সমস্তই যেন ধুয়ে মুছে একাকার হ'য়ে গেল। আমার বহু বৎসরের অনিদ্রা রোগ ও হজমের গোলমাল যেন কোন মন্ত্রবলে চিরদিনের জন্য ভালো হ'য়ে গেল। মহর্ষির সান্নিধ্য লাভ করে আমি

যেন নবজন্ম লাভ করে নব প্রভাতের নূতন আলোকে জেগে উঠ্লাম।”

দীর্ঘ তুইমাস কাল আশ্রমে অবস্থানের পর এলিয়েনর যেদিন আশ্রম ছেড়ে গেলেন সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল যেন নিজের প্রাণকে ছেড়ে যাওয়া এর চেয়ে অনেক সহজ। যাত্রার দিন সকাল থেকে, নিভৃতে বসে, তিনি সারাদিন শিশুর মত কেঁদেছিলেন। পাছে মহর্ষির সমক্ষে আত্মসম্বরণ করতে না পারেন সেই ভয়ে সারাদিন তিনি মহর্ষির ঘরে গেলেন না। অপরাহ্নে মহর্ষির ঘরে যখন লোকের ভীড় জমে উঠেছে তখন তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে বড় ঘরের একটি প্রান্তে গিয়ে বস্লেন। হাস্যোজ্জ্বল স্মিত মুখে মহর্ষি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত কর্লেন, বল্লেন—“বেচারি সারা দিন কেবল কেঁদেছে। আমাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে ওর মন সরে না!” বিদায়ের ক্ষণে বল্লেন—“আমার কাছে আবার ফিরে এসো। যেখানেই তুমি যাও, আমি সর্বদাই তোমার সংগে থাক্বো।”

মহর্ষির এই আশ্বাস ইষ্ট-কবজের মত বক্ষে ধারণ করে এলিয়েনর আশ্রম ছেড়ে গেলেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই তাঁর মনে হ'তে লাগলো মহর্ষিকে বাদ দিয়ে তাঁর জীবনের কোন অর্থ নেই। মনে পড়তে লাগলো তাঁর নিঃশব্দ প্রীতির, মৌন সহানুভূতির তুরতিক্রম্য আকর্ষণ। আপন যিনি তাঁকে

ছেড়ে বহুবিচিত্র পৃথিবীর কোনখানে গিয়ে সুখ নেই। এই কথাটি মনে হওয়ার সংগে সংগে মধ্য পথ থেকে এলিয়েনের আবার রমণাশ্রমে ফিরে এলেন এবং একাদিক্রমে আটমাস কাল সেখানেই র'য়ে গেলেন। এই সময়কার যে সমস্ত ছোটখাট ঘটনাগুলি তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলির মধ্যে অলৌকিক হয়তো কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তার মূল্য মাধুর্যের দিক দিয়ে বড় কম নয়।

অলৌকিক বল্‌তে সচরাচর আমরা যে সব অদ্ভুত বা বিস্ময়কর সংঘটনকে বুঝি; তেমনতর ব্যাপার মহর্ষির জীবনে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা না গেলেও, ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে মহর্ষির জীবনযাত্রার আশে পাশে চারিদিকেই অলৌকিকের ভীড়। এ অলৌকিক প্রতিদিনের আকাশে প্রাচীন সূর্যোদয়ের মতই সহজ এবং স্বাভাবিক। তাই এ অলৌকিক অতিমানবীয় অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবকে, সহজে অলৌকিক বলে চেনা যায় না। দেশদেশান্তরের মানুষ বহুদিনের দুঃখের বোঝা, বহুবিধ কামনা-প্রত্যাশার পাহাড় বয়ে নিয়ে মহর্ষির কাছে আসে। কেমন করে, কোন্ অভাবনীয় পন্থায়, তাদের বোঝাগুলি মহর্ষির দৃষ্টি প্রভাবে হাল্কা হ'য়ে যায় কে বল্‌বে? যারা আসে আর চলে যায়, কি তারা নিয়ে যায়? যারা আসে আর রয়ে যায়, কিসের নেশায় কোন্ আনন্দে, কোন্ মায়ায় তারা বিমোহিত হ'য়ে থাকে—সে কথা একমাত্র তারাই বল্‌তে পারে।

সামান্য কিছুক্ষণের জন্যও যাঁরা মহর্ষির সান্নিধ্য লাভ করেছেন তাঁরা বলেন মহর্ষির চোখদুটির কথা। মহর্ষির ব্যক্তিত্বের প্রধান আকর্ষণই তাঁর আয়ত সুন্দর জ্যোতির্ময় চোখদুটি। নানা জনে নানা ভাবে তাঁর দৃষ্টি-প্রদীপের বর্ণনা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে এ বস্তুর বর্ণনা হয় না। কিন্তু সবাই বলেছেন যে সে দৃষ্টি করুণার নির্ঝরিণী—কোমল, গভীর প্রেমসুন্দর ও মর্মস্পর্শী। দূর থেকে মহর্ষির কথা শুনে যাঁরা তাঁকে জ্ঞানীর পর্যায়ে ফেলেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে, কেবল তাঁর চোখদুটি দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে বলেছেন,—এ চোখ ভক্তের চোখ ছাড়া হতেই পারে না।

কিন্তু মহর্ষির অনুপম ব্যক্তিত্বের মুলসূত্রটি রয়ে গেছে তাঁর অনাড়ম্বর সরলতায়, সহজ মহত্বের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনায়। সর্ব মানবতার উর্ধে যাঁর স্থান তিনি সবার কাছে, সবার মাঝে, সাধারণের সমতলে কেমন করে নেমে আসেন—তার প্রত্যক্ষ আলেখ্য হিসাবে শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের পরবর্ত্তী বর্ণনাটি হৃদয়গ্রাহী ঃ

"আহারের সময়ে মহর্ষির সন্নিকটে বসে, আর সবাইকার সংগে তাঁর খাওয়া দেখতে দেখতে এই চিন্তাটিই আমার মনে ঘুরে ফিরে আস্‌ছিলো। মুগ্ধ হ'য়ে দেখছিলাম আহারকালে তাঁর মনের একটি দিক অন্তর্মুখী এবং আর একটি দিক হ'য়ে আছে সচেতন। ধীরে ধীরে, একান্ত পরিচ্ছন্নভাবে, প্রোজ্জ্বল

ধৈর্যের সংগে তিনি আহার্য গ্রহণ করছেন। তাঁর নিজের ভোজন সাংগ হওয়া পর্যন্ত কেউ যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকবে, তিনি তা পছন্দ করেন না। একবার এইভাবে আমাকে অপেক্ষা কর্‌তে দেখে তিনি অসহিষ্ণু হ'য়ে আমাকে উঠে যেতে ইংগিত করেছিলেন। মহর্ষির এই অনাড়ম্বর ভাবটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো। আর কি সুন্দর পরিচ্ছন্ন তাঁর খাওয়া! কলাপাতার বাইরে একটি ভাতও পড়তে পায় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকুও তিনি নেবেন না। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে পাতাখানি আংগুল দিয়ে চেঁচে চেটেপুটে সমস্তটুকু আহার্য গ্রহণ করে ছাড়বেন। পাতাটি আয়নার মত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লে তিনি আর সবাইকার সংগে ধীরে ধীরে হাত ধুতে যাবেন ;—কিন্তু কেউ যে তাঁর প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়ে একটু সরে গিয়ে তাঁর জন্য বিশেষভাবে একটু স্থান করে দেবে তাও তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

"তাঁর এই আত্মবিস্মৃত নিরভিমানের ভাবটি আমার ভারি ভাল লেগেছিল। তাঁর নড়াচড়ার মধ্যে কোনখানে নেই এতটুকু ইচ্ছাকৃত আতিশয্য। সহজাত মহত্বের রাজটীকা তাঁর ললাটে, সন্ধ্যামেঘের সীমন্তে সৌন্দয্যরেখার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে।............"

এই বর্ণনার পাশাপাশি যে দু'-একটি ছোটখাটো কথাবার্তার দৃষ্টান্ত দিলীপ বাবুর বিবরণে পাওয়া যায়, সে গুলিও কম

সুন্দর নয়। জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"সকলেই যদি এক শিব, তবে আপনি অপরের প্রণাম গ্রহণ করেন কেন?" মহর্ষি সংগে সংগে উত্তর দিলেন—"তা কেন নেব না? কারুর প্রণাম নেবার আগে, আমি নিজেই যে মনে মনে তার মধ্যে যে শিব আছেন তাঁর পায়ে আমার প্রণতি নিবেদন করে দিই!"

আর একবার জনৈক ভক্ত মহর্ষিকে অনুযোগ করে বলেছিলেন—"আপনার কাছে আমার কোন লাভই হল না।" উত্তরে মহর্ষি বললেন—"তার কারণ এই যে, তোমার কখনো কোন ক্ষতি হয় নি।"

দিলীপবাবুর বন্ধু আশ্রমসান্নিধ্য-বাসী ডাক্তার হাফিজ মহর্ষিকে জিজ্ঞেসা করেছিলেন—"আচ্ছা বলুন ত, এ ব্যাপারটা কি? ঈশ্বর মানুষের অন্যায় প্রার্থনার উত্তর দেন না—তার মর্ম বুঝি। কিন্তু ন্যায্য প্রার্থনা যে তিনি কেন কানে তোলেন না, সে এক রহস্য। এই ত আমি—অন্যায় কিছু চাই নি—কেবল এইটুকুই বারংবার প্রার্থনা করেছি যে আমি যেন তাঁর সত্যিকারের দাস হতে পারি। এও তিনি কেন শোনেন না?"

শিশুর মত সরল হাস্যে মহর্ষির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো। তিনি বললেন—"কারণ, তা হলে যে তুমি আর প্রার্থনা করতে না!"

শীতের দিনে মহর্ষিকে একবার দুখানি জামা গায়ে দিতে বলা হয়েছিল। উত্তরে মহর্ষি বললেন—"একেই ত আমাদের আত্মা বেচারী পাঁচ পাঁচটি স্থূল আবরণ পরে হাঁপিয়ে উঠেছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়—এই পাঁচটি জামার উপরে আরও দুটি চাপিয়ে দিতে চাও কোন প্রাণে?"

মহর্ষির প্রসংগে আর একটি ছোটখাটো কাহিনী বলে এই অধ্যায়ের শেষ করবো।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে মহর্ষি যখন পাহাড়ের পাদদেশে শিলাসনে উপবিষ্ট ছিলেন তখন বহুদিনের অনুগত একটি বানর তাঁর সাদর স্পর্শ লাভের আশায় তাঁর সম্মুখে এসে বসেছিল। বানরটির হাবভাব দেখে জনৈক ভক্ত নিছক কৌতূহল বশে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার মুখে সর্বদাই শুনি সাম্যের কথা। তবে কি মনে করবো যে এই বানরের মধ্যে যে আত্মা, আমাদের মধ্যেও তাই?"

স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে বানরটির দিকে চেয়ে মহর্ষি শুধু বললেন—"যে যেমন দেখে।"

মহর্ষির এই উক্তির অর্থ ভক্তটির কাছে পরিস্ফুট হল না। কিন্তু মহর্ষির তূষ্ণীভাব দেখে তিনিও আর কিছু না বলে চুপ করেই রইলেন। কিন্তু প্রশ্নটি তাঁর মনে রয়েই গেল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে অনুরূপ আর একটি দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে মহর্ষির পূর্বোক্ত উক্তিটির মর্মার্থ ভক্তটি বুঝতে

পারলেন। ঘটনাটি এইরূপ ঃ—প্রাতঃকৃত্য উপলক্ষে সেদিনও মহর্ষি আশ্রম সীমানার বহির্দেশে বিচরণ করছিলেন। এই সময়ে, মহর্ষির নিভৃত সংগ পাবার লোভে পূর্বোক্ত ভক্তটি মহর্ষির অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। পার্বত্য পথে কিছুদূর গিয়ে ভক্তটি মহর্ষির কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন তাঁর পূর্বেই আর কোন ভক্ত মহর্ষির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে থাকবেন। মহর্ষির কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে পথের বাঁকে অনতিদূরে মহর্ষিকে তিনি দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন মহর্ষির সংগে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। মহর্ষি একা ধূলি-মলিন পথ-প্রান্তে বসে আছেন আর তাঁর কোলের উপরে পা রেখে একটি রুগ্ন কদাকার কুকুর মহর্ষির মুখ চাটছে। মহর্ষি পুলকিত প্রসন্ন মুখে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর হেসে হেসে বলছেন—"সন্তোষম্? সন্তোষম্?"

ভক্তটি দেখলেন কুকুরটির সর্বাঙ্গে ঘা—পুঁযরক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এই ঘৃণ্য কুদর্শন প্রানীটির প্রতি মহর্ষির সদয় প্রসন্নতার অভিব্যক্তি চক্ষে দেখে ভক্তটি বুঝতে পারলেন মহর্ষির পূর্বদিনের কথাটির মর্মার্থ।

মহর্ষির সম্বন্ধে তাঁর প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়ানো এমনিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা, সেবকবৃন্দের অভিজ্ঞতায় কত যে সঞ্চিত হয়ে আছে তার অন্ত নেই। প্রত্যহের পায়ে চলা পথে এরা যেন ঘাসের ফুল। চোখের কাছে তুলে

দেখলে তবে এদের অলৌকিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে। সর্বদাই যারা দেখে তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে ভুলে যায়। অতিপরিচয়ের আড়ালে বৈশিষ্ট্য যায় ঢেকে।

মহর্ষির জীবনকাহিনীকে উপলক্ষ্য করে যা কিছু এই ক'খানি পাতায় বলা হল, এর মধ্যে মহর্ষির পরিচয় কতটুকুই বা প্রকাশিত হয়েছে! ঈশ্বরের পরিচয় সঠিকভাবে দিতে পারেন আর একজন ঈশ্বর। ভগবান রমণের পরিচয়ের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটি বলা যায়। গঙ্গাজল স্পর্শ করে লোকে পবিত্র হয়। ভাগিরথীর সমস্ত জল বা সমগ্র বিস্তার পরিদর্শন না করেও এই পবিত্রতা লাভ করা যায় বলে আমরা বিশ্বাস করি। মহর্ষি রমণের জীবন-ভাগিরথীর পবিত্র বারি, এই পূণ্য কথা প্রসঙ্গে আমরা স্পর্শ করে ধন্য হয়েছি। ভগবান রমণ মহর্ষির জয় হোক!

পরিনির্বাণ

এ পর্যন্ত মহর্ষি-জীবনীর একটানা ধারাবাহিকতার বক্ষে কোনরূপ পরিচ্ছেদের বিভাগ টানা হয় নি। ব্যতিক্রম ঘটলো, অপরিহার্য ভাবে এই তথাকথিত শেষ পরিচ্ছেদে। তথাকথিত—কারণ অসীমের নেই সীমা, অশেষেরও নেই শেষ। মরদেহে অধিষ্ঠান কালেই যিনি মরদেহের সমস্ত প্রাকারকে অতিক্রম করে ভূমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁর জীবনের শেষ দুই তিন বৎসরের লীলা-কাহিনীর সংগে বাস্তবিক পক্ষে তাঁর নিজের কোন যোগ নেই। কিন্তু তথাপি যে দেহ-মন্দিরের বেদীতলে শত সহস্র ভক্তের শ্রদ্ধাভক্তির আরতি-প্রদীপ জ্বলেছে দীর্ঘ চুয়ান্ন বৎসর ধরে, সেই দেহ-মন্দিরে মহর্ষি রমণের শেষ-লীলার পরম গম্ভীর পরিশিষ্টটুকুকে বাদ দিলে চলে না।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি, মহর্ষি রমণের বাম বাহুর মধ্যগ্রন্থির পাশে ছোট একটি যব-পরিমাণ স্ফীতি দেখা গিয়েছিল। পতন জনিত সামান্য আঘাতের ফলে এর উদ্ভব হয়েছিল বলে প্রথমটা এদিকে বিশেষ কোন দৃষ্টি পড়েনি। কিন্তু দিনে দিনে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে স্ফীতিটি বাড়তে লাগলো। বলা বাহুল্য মহর্ষি নিজে এই দৈহিক পীড়ার প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ অমনোযোগী।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ফুলোটি বর্দ্ধিত হয়ে প্রায় একটি আমলকির আকার ধারণ করেছে দেখে, আর কালবিলম্ব না করে অস্ত্রোপচার করানো হল। মহর্ষির এ বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। কারণ চিরদিনই তিনি একভাবে স্বভাব-ধর্মে নির্ভরশীল। দিন দশেকের মধ্যে ঘা শুকিয়ে এলো কিন্তু ঘায়ের উপরের চর্মাবরণটিকে ঠিক সুস্থ বলে মনে হল না। মাতৃভূতেশ্বর মন্দিরের কুম্ভ অভিষেক উৎসবে মার্চ্চ মাসে তিনি যথারীতি যোগদান করলেন। উৎসবান্তে মাদ্রাজ থেকে অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসকগণ ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে ক্যান্সার বলে সিদ্ধান্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হল। টিস্যু পরীক্ষায় জানা গেল রোগটি সারকোমা। একদিকে ক্ষতস্থান শুকিয়ে আসতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল নতুন করে রোগের লক্ষণ ঠেলে উঠছে। চিকিৎসকগণ উপায়ান্তর না দেখে বাম হাত খানি কেটে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিলেন।

মহর্ষির অভিমত জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভাবে উত্তর দিলেন—"দেহটাই ত একটা রোগ। আগে হোক পরে হোক এ দেহের মৃত্যু ও পতন অনিবার্য। তবে কেন অংগহানি করে মিথ্যা আতংকের সৃষ্টি করা! ক্ষতস্থান ভাল করে বেঁধে রাখলেই ত চলে!"

এই সময়ে আশ্রমবাসীরা যুক্তি করে ডেকে আনলেন একজন গ্রাম্য চিকিৎসককে। বহুবৎসর পূর্বে ইনি একবার শ্রীভগবানের ভগ্ন কণ্ঠাস্থির চিকিৎসায় সফল হয়েছিলেন। কিন্তু এবারে এঁর চিকিৎসায় রোগের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়ে ক্ষত বিষাক্ত হয়ে উঠলো।

মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকমণ্ডলী পরামর্শ করে স্থির করলেন যে অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন। তাঁরা বিধান দিলেন যে মহর্ষির প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নেই। অতঃপর আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের সম্মিলিত ব্যবস্থায় তৃতীয়বার শ্রীভগবানের দেহে অস্ত্রোপচার হল এবং রোগের পুনরাবির্ভাব প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে রেডিয়াম চিকিৎসাও করা হল। পরবর্তী তিনটি মাস পর্যন্ত মহর্ষি সুস্থ রইলেন। মনে হল যেন তাঁর শরীরেরও খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কিছুতেই কিছু হবার নয়। ১৯ শে ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় আবার মহর্ষির দেহে হল অস্ত্রোপচার। এবারে দেখা গেল রোগ ভিতরের দিকে মূল বিস্তার করে বিষম জটিল হয়ে উঠেছে। বোঝা গেল, এই চতুর্থ বার অস্ত্রোপচারের পরে কোন অবস্থাতে আর মহর্ষির দেহে এ আসুরিক চিকিৎসার প্রয়োগ সম্ভব হবে না।

এখন থেকে হোমিওপ্যাথী ও আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা চলতে লাগলো। রোগের উপসর্গ উত্তরোত্তর সর্পিল ও দ্রুত-গতিতে বেড়ে চললো। রোগ ক্রমে ঠেলে উঠলো বগলের কাছ পর্যন্ত।

এই মারাত্মক রোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবার আমরা মহর্ষি রমণের তাৎকালিক মনোভাব ও উক্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করবো।

প্রথম থেকেই অস্ত্র চিকিৎসার ব্যাপারে মহর্ষি তাঁর নিজস্ব ভাবের কথায় বলেছিলেন—"তেমন যন্ত্রণা যখন নেই তখন এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কি হবে? আপনি যা হয় সেই ত ভাল!" আশ্রমের ভক্তরা জানতেন যে কথাটি মহর্ষির সমস্ত কথার মর্মকথা। স্থিরতা, মৌনতা, নিশ্চিন্ততা নিরপেক্ষতার কথাই যিনি সারা জীবন বলে এসেছেন এবং বলার চেয়েও জীবন দিয়ে প্রমাণ করে এসেছেন, নিদারুণ দৈনিক যন্ত্রণাও যে মুহূর্তের জন্য তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর সৃষ্টি করতে পারবে না তা স্বাভাবিক। বরং অনেক সময়ে মনে হতো, ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায়, মহর্ষি যেন অন্য একজন কার কথা বলছেন।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদ—কোন পদ্ধতিতে চিকিৎসা হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি হেসে বলেছিলেন—"চিকিৎসা কি আমি চাইছি? আমার হয়ে তোমরাই যদি চিকিৎসার ইচ্ছা করে থাকো তবে

তোমরাই মাথা খাটিয়ে যা হয় একটা ঠিক করো। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি চিরদিন যা বলে এসেছি তাই বলবো—কোন চিকিৎসারই প্রয়োজন নেই। আপনা থেকে যা হবার, হয়ে যাক!”

ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে যখন মহর্ষিকে চিকিৎসার যাবতীয় বিড়ম্বনা স্বীকার করে নিতে হল তখন দেখা গেল নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কিছুমাত্র মর্যাদা যেন তাঁর কাছে আর রইলো না। অত্যন্ত সহজ প্রসন্নতার সঙ্গে তিনি ক্ষণে ক্ষণে সবাইকার দুশ্চিন্তার বোঝা, প্রাণখোলা হাস্যে দিয়েছেন হাল্কা করে। কে বলবে তিনি গুরুতর ভাবে পীড়িত! আগষ্ট মাসে, যেদিন তাঁর দেহে তৃতীয় বার অস্ত্রোপচার হল সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর কক্ষের বাইরে শত শত উৎকণ্ঠিত নরনারী অপেক্ষা করছে শুনে, তিনি চিকিৎসকগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করেও, তাদের ডেকে এনে স্বেচ্ছায় দিলেন দর্শন। যাঁরা সেইদিন দর্শন পেলেন—তাঁরা দেখলেন, কোথায় রোগী? সেই হাস্যমুখ সদা প্রসন্ন দেবমূর্তি চিরাচরিত মহত্বে অনিন্দ্য রূপে বিরাজ করছেন।

পরিনির্বাণের দশদিন আগে পর্যন্ত তাঁর প্রাত্যহিক দিনচর্যার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবার উপায় ছিল না। শরীর এত দূর্বল যে উঠে বসতেও কষ্ট হয়। সেই অবস্থাতেও ভোর পাঁচটায় উঠে প্রাতঃস্নান করেছেন সমাপন। দর্শন-

প্রার্থীদের নিয়মিত ভাবে দর্শন দিয়েছেন। আশ্রমের চিঠিপত্র পড়েছেন, পাণ্ডুলিপি দেখেছেন, যেমনটি যা হওয়া উচিত সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দেবদুর্লভ কণ্ঠ ছিল সতেজ।

মহাপ্রয়াণের একবৎসর আগে থেকে কত ভাবে কত বারই তিনি তাঁর আসন্ন বিদায়-বার্তার ইংগিত সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—"ভারবাহী কুলি যেমন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে বোঝা ফেলে দিয়ে হাল্কা হয়ে যায়, জ্ঞানীও ঠিক তেমনি করে দেহপাতে হাল্কা হয়ে যায়।" বলেছেন—"দেহবোধ যার নেই, দেহান্তরে তার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তার পক্ষে সবই ত আত্ম-স্বরূপ। মিছরি গুঁড়িয়ে ফেললেও তার মিষ্টতার কোন হ্রাস হয় না।"

মহাপ্রস্থানের দুদিন আগে ভাগ্যবান দর্শন প্রার্থীরা যখন একটির পরে একটি করে তাঁর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁদের প্রত্যেকের পানে বিশেষ অর্থপূর্ণ ভাবে দৃষ্টি-পাত করেছিলেন। আশ্রমবাসী অনেকেরই তখন মনে হয়েছিল এই তাঁর অন্তিম কৃপাকটাক্ষ—শেষ দৃষ্টি-প্রসাদ। হলও ঠিক তাই। পরের দিন, বৃহস্পতিবার সকালে যে দর্শনপ্রার্থীরা তাঁর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের দিকে চোখ তুলে চাইবার মত শারীরিক শক্তি তাঁর আর ছিল না। কিন্তু তখনো ছিলেন তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন।

বৃহস্পতিবার সকালে সেবকেরা এলেন সেবা করতে। মহর্ষি বললেন—"যাও নিজের কাজ করো গে—আত্মচিন্তা করো গে।" ডাক্তারকে বললেন—"ঔষধের আর দরকার নেই। দু দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" কথাগুলি কি অর্থে তিনি বলেছিলেন তার চূড়ান্ত মীমাংসা পরের দিনেই হয়ে গেল। কিন্তু সরলপ্রাণ বহু ভক্তেরই মনে কথাগুলি শুনে আশা হয়েছিল বুঝি ভগবান এ যাত্রা ভক্তদের ছেড়ে যাবেন না।

শুক্রবার ১৪ই এপ্রিল ১৯৫০ তারিখের সকাল থেকে মহর্ষি শয্যা ছেড়ে উঠে বসেন নি। কিন্তু সারাদিন পুরোপুরি জ্ঞান ছিল। সেদিনও অপরাহ্নে দর্শনার্থী নরনারী একে একে এসে শেষ দর্শন লাভ করেছেন। পরিনির্বাণের দুঘণ্টা আগে মহর্ষি শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসতে চাইলেন। অতি সন্তর্পনে দেবদেহ সেবকেরা তুলে বসিয়ে দিলেন। দূর্বলতার জন্য মাথাটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল বলে সেবকেরা সেটিকে যথাস্থানে ধরে রাখলেন।

সন্ধ্যার পর থেকেই ধীরে ধীরে শ্বাস গভীর হয়ে উঠতে লাগলো। সেবক ও ডাক্তারে মিলে মহর্ষির ঘরে তখন মাত্র দশ বারো জন ছিলেন উপস্থিত। শ্বাস গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগলো। কক্ষের মধ্যে নিরুদ্ধ নিস্তব্ধতা। বাইরের আকাশের বাতাসে অখণ্ড নীরবতা। সন্ধ্যার ছায়া অরুণাচল পর্বতের শিখরে ক্রমেই গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠছে।

রাত্রি ৮টা ৪৭ মিনিটের সময় মহাপ্রয়াণের লগ্নটি এসে উপনীত হল। ধীরে ধীরে শেষ নি:শ্বাসটি মৃদু থেকে মৃদুতর হতে হতে পরব্যোমে গেল মিলিয়ে। ভাগ্যক্রমে যাঁরা কাছে ছিলেন তাঁর সবাই রইলেন মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে। বিদেহ মহাপুরুষের পরম প্রভাবে এই চরম ক্ষণেও মনে এলো না এতটুকু শোকের ছায়া। সকলেরই মনে হতে লাগলো তিনি রয়েছেন—আরও পরিপূর্ণভাবে, মরণাতীত গভীরভাবে তিনি বিদ্যমান। জীর্ণ বস্ত্রের মত অপ্রয়োজনীয় দেহটিকে পরিত্যাগ করে দেহাতীত পরম সত্বায় ভাস্বর হয়ে তিনি আছেন।

মহর্ষি রমণের মহাপ্রয়াণ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি নৈসর্গিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। রাত্রি ৮টা ৪৭ মিনিটের সময় যখন তাঁর শেষ নিঃশ্বাসটি অনন্ত মহাব্যোমে মিলিয়ে গেল ঠিক সেই মুহূর্তে বহুদূরব্যাপী গগনের বক্ষ চিরে, অত্যুজ্জ্বল উল্কাপাতের মত একটি জ্যোতি-শিখা অরুণাচল পর্বতের শিখরে এসে গিয়েছিল মিলিয়ে। সমগ্র দক্ষিণ ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টি যখন এই জ্যোতির উপরে নিবদ্ধ ছিল তখন মহর্ষির কক্ষের দশ বারো জন সেবক একদৃষ্টে মহর্ষির মুখের পানে চেয়ে ছিলেন।

---

* মহর্ষির মরজীবনের অন্তিমলীলার বিবরণের জন্য আমরা আশ্রমবাসী তপস্বী শ্রীবিশ্বনাথমের কাছে ঋণী।